অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬২।

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সব্রত মাজী

অক্ষর বিন্যাস
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শিবদুর্গা প্রেস
৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

পরম শ্রদ্ধাভাজন

স্বামী সত্যব্রতানন্দজীর

করকমলে

[illegible] যেমন উদয়, বিবর্জ আর অস্ত, সেইরকম
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহা, মহান জীবনেরও তিনটি
পর্ব — আবির্ভাব, অবস্থান ও অস্ত।

এই প্রকারের আত্মা বলব উদয় পর্ব। বিদ্যাসাগর এই
সময়ের শিক্ষায় আলোকিত বলয়টায় উদিত হল যাঁরা
যাঁরা উজ্জীবিত হল উনিশ শতকের আকাশে। এতজন
মানুষ একই খানখান করে দিতে চাইছেন আমাদের অন্ধকার
মানুষের বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, সমাজের বিকাশই
ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ চাইতেন
হিন্দু সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করে তাদের
মুখে অন্ন তুলে দিতে। বেদান্তকে সেবা দিতে
মেধার ঐশ্বর্যে, মন আর মননের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ
এক মানুষের জীবন অবধারণ করা কি সহজ কাজ।
তাঁকে বলা হত 'নেপোলিয়ান'। তাঁর জীবন সংগ্রামের
জীবন। তিনি যেন মানব বজ্র। তাঁর সামনে মহা
হেঁট হয়ে আসে।

প্রবন্ধটির এই প্রথম অনুচ্ছেদে বলা যেতে পারে
উদয় পর্ব। এই গগনে সুদীপ্ত এক ভাস্কর সূর্য।
আলোয় আলোকিত সব দিক। পরবর্তী পর্যায়ে
থাকবে — আসবের অবস্থান। কি এক খানি জীবন
'তোমার মহান করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

একটি ঘোড়ার গাড়ি আসছে। ভেতরে বসে আছেন দু'জন বাঙালি ভদ্রলোক। একজন একটু ভারিক্কি চেহারার। শিক্ষক শিক্ষক ভাব। গভীর গম্ভীর বদনমণ্ডল তাঁর। অন্যজন অতি আনন্দময়। জ্যোতির্ময়। বিপরীতদিকের আসনে বসে আছেন আরো একজন। সুদর্শন এক যুবক। গাড়িটি আসছে শ্যামবাজারের দিক থেকে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়েছে। আগস্ট মাসের বিকেল। ঘড়িতে বেজেছে চারটে।

শ্রাবণের কলকাতা। কখনো বৃষ্টির ঝিরি, কখনো গুমোট রোদ। কখনো বারিসিক্ত বাতাস, কখনো ভ্যাপসা গুমোট। আবহাওয়া তেমন স্বস্তিকর নয়। ঠিকা গাড়ি, দুর্বল বাহন। তিন-জন উজ্জ্বল মানুষ। গাড়ি আসছে।

একটি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়িটি এসে দাঁড়াল। ইংলিশ স্টাইলের বাড়ি। চারপাশে বাগান। মাঝখানে বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। জায়গাটার নাম বাদুড় বাগান। কলকাতার বিখ্যাত একটি অঞ্চল। অনেক বাগান এই কলকাতায় আছে—সিকদার বাগান, নন্দন বাগান, হালসীবাগান, নারিকেল বাগান, পার্শীবাগান। সার্কুলার রোডের দুধারে বাগানের পর বাগান। বড়ো বড়ো মানুষের বসবাস। বিশ্বম্ভর মল্লিক, শান্তিরাম সিংহ, কাশীনাথ বাবু, রূপচাঁদ রায়। পূর্বদিকে রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত উদ্যান। বিশাল, বিশাল বাগান রসাল ফলের গাছে পরিপূর্ণ। রাত্তির বেলা হাজার হাজার বাদুড় হুসহুস করে এসে পড়ত এই সব ফলের গাছে। দিনের বেলা ডালে ডালে ঝুলত বাদুড়। রামবাগান থেকে নারকেল ডাঙা বাদুড়ঝোলা বাগানের পর বাগান। বাদুড়দের নামে নামাঙ্কিত এই বিখ্যাত 'বাদুড় বাগান'।

গাড়ি যে বাড়িটির সামনে দাঁড়াল, তার ঠিকানা ২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেন।

সাত বছর আগে তৈরি হয়েছে এই বাড়ি। গৃহস্বামী নিজের বসবাসের জন্যে এই বাড়ি তৈরি করতে চাননি। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি

প্রভৃতি ভাষায় তাঁর সংগ্রহে ১৬০০০ দুর্লভ বই। গ্রন্থই তাঁর প্রাণ। নিজের দেহের ওপর তাঁর যত না যত্ন, এই বইগুলির উপর যত্ন অনেক বেশি। অনেক টাকা খরচ করে বই সব বাঁধান হয়েছে। চামড়ার বাঁধাই। সোনার-জলে নাম লেখা। এতকাল কলকাতার এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে দিন কাটিয়েছেন। কখনো সুকিয়া স্ট্রিটে, কখনো বউবাজারে, মেছুয়াবাজারে, আমহার্স্ট স্ট্রিটে, কিছুকাল কাশীপুরে। মানুষ ঘুরে ঘুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতে পারে। বই পারে না। বইয়ের জন্যে চাই স্থায়ী বাসস্থান। এই বাড়িটি সেই কারণেই নির্মিত। ষোলো হাজার দুর্লভ গ্রন্থের একটি স্থায়ী আবাস।

গাড়ি থেকে অতি সাবধানে সেই জ্যোতির্ময় মানুষটিকে নামানো হচ্ছে। তিনি পাদানিতে ডান পা রেখেছেন। বার্নিশ করা ঝকঝকে চটি। সাদা ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবি। সম্পূর্ণ ভাবস্থ। যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। ফটক দিয়ে প্রবেশ করেছেন তিন জনে। বাগানের পথে এগোচ্ছেন দক্ষিণের সদর দরজার দিকে। বর্ষার জল পেয়ে ফুলের বাগান ফুলে ফুলে ভরে আছে। কামিনীর গন্ধে আমোদিত চারপাশ।

পশ্চিমের একটি ঘর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। উঠেই উত্তরে একটি ঘর। পূব দিকে হলঘর। হলঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি শয়নকক্ষ। হলঘরের ঠিক দক্ষিণে আর একটি ঘর। শয়নকক্ষটি ছাড়া সব ঘরই পুস্তকে পরিপূর্ণ। ষোলো হাজার বহুমূল্য পুস্তকের শ্রীনিকেতন। তাকিয়ে দেখার মতো। সারি সারি বইয়ের র‍্যাক। সুন্দর বাঁধাইয়ে ঝকঝকে সব বই। এতটুকু ধুলো নেই। ব্যক্তিগত পরিচর্যার ছাপ সর্বত্র। হলঘরের পূর্বদিকে একেবারে শেষ সীমানায় একটি টেবিল। আর চেয়ার। চেয়ারে যিনি বসবেন, তিনি পশ্চিমাস্য হবেন। চারপাশে আরো অনেক চেয়ার। টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে, কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং পেপার। রয়েছে অজস্র চিঠি, বাঁধানো হিসেবপত্রের খাতা। চিঠিগুলি কিছু দিতে চায় না; কেবল পেতে চায়। হাসি নেই শুধু কান্না। একগুচ্ছ বিপর্যস্ত সমাজচিত্র। অক্ষরের আর্তনাদ, 'আমি এক অনাথ বিধবা, আমার অপোগণ্ড শিশুটিকে দেখার কেউ নেই, আপনাকে দেখতে হবে।' 'আপনি বায়ু পরিবর্তনে বাইরে গিয়েছিলেন, যথাসময়ে আমরা আমাদের মাসহারা পাইনি, বড়ো কষ্ট হয়েছে।' 'আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হয়েছি, কিন্তু আমার বই কেনবার ক্ষমতা নেই।' 'আমার পরিবারবর্গ

খেতে পাচ্ছে না। আমাকে একটা চাকরি করে দিতে হবে।' 'আমি আপনার স্কুলের শিক্ষক। আমার ভগিনী বিধবা হয়েছে। তার সমস্ত ভার আমাকে নিতে হয়েছে। মাইনে না বাড়ালে চালাতে পারছি না।' বিলেতের চিঠিও আছে, 'আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠিয়ে আসন্ন বিপদ হতে আমাকে রক্ষা করুন'। কোনো চিঠিতে নিবেদন, 'সালিশির দিন নির্ধারিত। আপনি সেদিন এসে আমাদের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে উত্তরের ঘরে তিন-জন ঢুকলেন। উত্তরে, একধারে পালিশ করা লম্বা চার-কোণা একটা টেবিল। চারপাশে বসার আয়োজন। চেয়ার আছে, হেলান দিয়ে বসার বেঞ্চ আছে। ঘরটি ছোটো নয়, বেশ প্রশস্ত।

তিন জন ঢোকা মাত্রই টেবিলে যিনি বসেছিলেন, সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতির্ময় মানুষটি ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে এগোচ্ছেন। তিনি দেখছেন। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই কমছে। একেবারে সামনে এসে জ্যোতির্ময় মানুষটি অতি মধুর গলায় বললেন, 'আজ যে আমি সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, আজ আমি সাগর দেখছি।' ঊনবিংশ শতকের দুই কল্পতরু মুখোমুখি। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ আর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র।

এই কথা, এই সাক্ষাৎকার সেই মুহূর্তে ইতিহাস হয়ে গেল। কাল সব মুছে দেবে। সময়কে তৈরি করে ফেলবে অতীতের ফসিল; কিন্তু এই দেখা এই কথা কালজয়ী চির-বর্তমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেঞ্চে বসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর চেয়ারে।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর স্বরে বললেন, 'না গো! নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র।'

এই দৃশ্য, এই কথা সময়ে 'পাঞ্চ' হয়ে গেল। ১৮৮২ সাল, ৫ আগস্ট। বাষট্টি বছরের পথ হেঁটে বিদ্যাসাগর এই এতটা এসেছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছেচল্লিশ। দুজনেই গ্রাম থেকে এসে কলকাতা জয় করেছেন। একজন বীরসিংহের, আর একজন কামারপুকুরের। একজনের পথ জ্ঞান আর কর্মের, আর একজন নিঃশব্দে সাধনপথের পথিক। গীতার দুটি অধ্যায় মুখোমুখি। কর্ম আর ভক্তি দুজনেই পৌঁছে গেছেন শিবের মন্দিরে। বুঝেছেন, শিবই জীব। দুজনেরই হৃদয় বড়ো হতে হতে এতটাই বড়ো হয়েছে যে একটি

পিঁপড়ের দুঃখও অনুভব করেন। দুজনেই নির্মাণ করতে চান নতুন এক পৃথিবী। যে পৃথিবীতে মানুষের চোখে দুঃখের জল থাকবে না। অত্যাচারিতের আর্তনাদ থাকবে না। বঞ্চিতের বিষাদ থাকবে না। একজন তেজের অধিকারী। অন্যজন প্রেমের।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর যে দুজন এসেছেন, তাঁদের একজন হলেন ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীম নামে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত লিখে কালে যিনি বিখ্যাত হবেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশানের প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয়জন ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় যাঁর নাম থাকবে। মহেন্দ্রনাথের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের অনেক কথা শুনেছেন। শুনেছেন বলেই দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনভূমি থেকে ছুটে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন, পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে একটা হাত- কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চারপাশ উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো। বাঁধানো দাঁত। যখন কথা বলেন দেখা যায়। ঝকঝকে উজ্জ্বল। মাথাটা দেহের তুলনায় খুবই বড়ো। উন্নত ললাট। সামান্য খর্বাকৃতি। পৈতেটি গলার কাছে দেখা যাচ্ছে।

তোমার অনেক গুণ বিদ্যাসাগর। এই মাস্টার আমাকে বলেছে। প্রথম—তোমার বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে চোখের জলে বলেছিলে, 'আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল যে, পড়াশোনা করি, কিন্তু কই তা হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।'

দ্বিতীয়— তোমার সর্বজীবে দয়া। তুমি তো শুধু বিদ্যার সাগর নও, দয়ারও সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয় বলে তুমি দুধ খাওয়া বন্ধ করেছিলে।

ঘোড়া নিজের কষ্ট বলতে পারে না, তাই তুমি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ো না। একদিন তুমি এক ঝাঁকা-মুটেওলাকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিলে। একপাশে পড়ে আছে তার ঝাঁকা। সেই মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় মানুষটিকে কোলে করে বাড়িতে তুলে এনে তুমি চিকিৎসা করেছিলে।

তৃতীয়—তোমার স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে মতের অমিল হল বলে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের পদ সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিলে।

তোমার চতুর্থ গুণ—লোকাপেক্ষায় না থাকা। তুমি এক শিক্ষককে ভীষণ ভালোবাসতে। তাঁর মেয়ের বিয়ের আইবুড়ো ভাতে কাপড় বগলে নিজেই

চলে গেলে।

তোমার পঞ্চম গুণ—তোমার মাতৃভক্তি আর মনোবল। মা বলেছিলেন, ঈশ্বর তুমি যদি তোমার ভাইয়ের বিয়েতে না আসো তাহলে আমার মন ভীষণ খারাপ হবে। তুমি কলকাতা থেকে হাঁটতে শুরু করলে। পথ আটকে পড়ে আছে দামোদর। পারাপারের নৌকো নেই। সাঁতরে নদী পার হলে। বিয়ের রাতেই ভিজে কাপড়ে মায়ের কাছে—এই দেখ মা, আমি ঠিক এসেছি।

এইসব যতই ভাবছেন ততই ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্যে যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে— কিন্তু এ রজোগুণ-সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নেই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দেবার জন্যে। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতেও ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছোই।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'কেমন করে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!'

বিদ্যাসাগর হাসছেন আর বলছেন, 'কলাই-বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ো স্নেহমাখা গলায় বললেন, 'তুমি তা নয় গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, নজর কিন্তু ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য, বিদ্যার ঐশ্বর্য।'

'একটি এঁড়ে বাছুর'

'বীরসিংহের আধক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্ন সময়ে হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমর গঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।' এই

সময়ে আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, ওদিকে নয়, এদিকে এসো, আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি'। এই বলিয়া, সূতিকা-গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।'

বালক ঈশ্বরচন্দ্র মাঝে মাঝে বড়ো অবাধ্য হতেন। ভীষণ একগুঁয়ে। না তো না, হ্যাঁ তো হ্যাঁ। পিতার প্রহার-যন্ত্র সদ্যই উদ্যত। তিরস্কার তো আছেই। অবাধ্য ঈশ্বরকে বাধ্য করা মানুষের অসাধ্য। পিতা ঠাকুরদাস কখনো কখনো বয়স্যদের বলতেন 'ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন, তাঁর পরিহাস বাক্য বিফল হওয়ার নয়; বাবাজি আমার ক্রমে-ক্রমে এঁড়ে গরুর চেয়েও একগুঁয়ে হয়ে উঠছেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, 'জন্মসময়ে পিতামহাদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইত।'

১৮২০ সাল। আশ্বিন মাসের ১২ তারিখ, মঙ্গলবার। দুপুরবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন। গ্রামটির নাম বীরসিংহ। ভগবতী দেবী কোল পেতে দিলেন। সেই সময় বীরসিংহ ছিল হুগলি জেলার অন্তর্গত। পরে বাংলার খ্যাতনামা লেফটেন্যান্ট গবর্নর ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে বীরসিংহ ঢুকে গেল মেদিনীপুর জেলায়।

বীরসিংহ গ্রামে আমরা একটু পরে আসব, আগে চট করে 'জাহানাবাদটা' ঘুরে আসি। 'আকবরনামায়' 'জাহানাবাদ'-এর নাম রয়েছে। বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত বাদশাহি রাস্তা। সেই পথের পাশে জাহানাবাদ। গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৫৯০ সাল মানসিংহ উড়িষ্যা অভিযান করবেন। সৈন্যসামন্ত নিয়ে বর্ধমান হয়ে এই সড়ক ধরে জাহানাবাদ এসে তাঁবু লাগালেন। বর্ষা প্রবল। তিন মাসের অবস্থান। 'আকবরনামার' ইংরিজি অনুবাদে রয়েছে—Man Singh Cantoned his troops here, waiting till the end of the rains would enable him to take the field. সময়যাত্রার পথের পাশে

ইতিহাসের বাতাসে একখণ্ড প্রকৃতির নাম জাহানাবাদ। অতীতে অলৌকিক-শক্তির অধিকারী এক ফকির এখানে বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল জাহান শা। ফকিরের দেহরক্ষার পর তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তগণ অঞ্চলটির নামকরণ করলেন 'জাহানাবাদ'। গয়া জেলায় জাহানাবাদ নামে একটি জায়গা আছে। একই নামে দুটি জায়গা থাকায় মহা গোলমাল। ইংরেজ সরকার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেটের' এক বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, হুগলির 'জাহানাবাদ'-এর নাম পালটে 'আরামবাগ' করা হল। এখানকার ধনী প্রতাপশালী মিঞাদের 'আরামবাগা' নামের উদ্যানের নামে, নাম হল, 'আরামবাগ'। The name which means the garden of ease, refers to a garden of Miyans once the most influential family in the place.

এই জাহানাবাদের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে বনমালীপুর। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা এই গ্রামেই থাকতেন। একটি শাখা কেন বীরসিংহে চলে এলেন। কারণ, সেই আদি সমস্যা ভ্রাতৃবিরোধ। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর পাঁচসন্তান—নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন, রামচরণ। ভুবনেশ্বরের পরলোকগমনের পর পরিবারের কর্তা হলেন নৃসিংহরাম ও গঙ্গাধর। তুচ্ছ কারণে নিত্য কলহ। আর এই কলহের ফলভোগ করতেন রামজয়। তাঁর বরাতে বাঁধা নিদারুণ অপমান, নির্দয় ক্লেশ। সেই অসহ্য পরিবেশ থেকে একদিন তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন। সকালে উঠে দেখা গেল তিনি নেই। একদিন গেল, দুদিন গেল। বনমালীপুরে পড়ে রইলেন তাঁর স্ত্রী। দুইপুত্র আর চারকন্যা।

দুর্গাদেবীর পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত তৎকালের এক বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর বসবাস বীরসিংহ গ্রামে। রাঢ়দেশের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ। পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয়েছে। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক অতিপ্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশও উপস্থিত আছেন। ব্যাকরণে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে সেই পণ্ডিতমণ্ডলের সামনে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমাপতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শতগুণ বেড়ে গেল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

প্রখ্যাত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যা দুর্গাদেবী। স্বামী দেশত্যাগী হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ কিছুদিন তিনি শ্বশুরবাড়িতে রইলেন।

অবশেষে আর পারলেন না। অনাদর আর অত্যাচার সহ্যসীমা অতিক্রম করে গেল। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এলেন পিত্রালয়ে। তর্কসিদ্ধান্তমশাই শুধু অদ্বিতীয় বৈয়াকরণই ছিলেন না, অদ্বিতীয় পিতাও। তিনি কন্যার বৃহৎ সংসারটিকে সাদরে, সসম্মানে গ্রহণ করলেন। তিনি গ্রহণ করলে কী হবে!, বয়েসের ভারে জীর্ণ। সংসারের কর্তৃত্ব, পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে। বৃদ্ধবৃদ্ধাত্ততো আশ্রিতের মতোই। নিজেদের মত খাটাতে চান না, খাটালেও খাটে না। দুর্গাদেবী আশ্রয় পেলেন, শান্তি পেলেন না। সাতটি প্রাণীর ভার গ্রহণ কী সহজ কথা! ভ্রাতা আর ভ্রাতৃবধূর অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। বুঝে গেলেন, পিতামাতার আশ্রয়ে সুখে দিন কাটাবার স্বপ্ন ভেঙে গেল। বরাতে সুখ নেই।

তখন পিত্রালয়ের অদূরে, ক্ষুদ্র একটি কুটির নির্মাণ করিয়ে শুরু করলেন দুঃখের জীবন। ভদ্র পরিবারের অসহায় স্ত্রীলোক। উপার্জনের কি হবে? সাতটি মুখে ক্ষুধার অন্ন। ভরসা হল চরখা আর টেকুয়া। সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করে যা পাওয়া যায়। কায়ক্লেশে দিনাতিপাত। দুর্গাদেবী সেই পথই ধরলেন। একা হলে, হয়তো হত। শাকভাত, নুনভাত। সাত-সাতটি প্রাণী। পিতা মাঝে মধ্যে সামান্য সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু দিন যে আর চলে না।

দুর্গাদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র—ঠাকুরদাস। বয়েস পনেরো বছর। অবাক হয়ে দেখে মায়ের সংগ্রাম। কীভাবে কী হচ্ছে। কী ভীষণ দারিদ্র্য, কী হাড়ভাঙা অসহনীয় পরিশ্রম। অত বড় স্বনামখ্যাত এক পণ্ডিতকন্যার কী দুরবস্থা! ঠাকুরদাসের বুক কেঁপে যায়। বাঁচতে তো হবে। বাঁচতে তো হবে!

চলো কলকাতা

'ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতির চাল।
নকলে বাঙালিবাবু হল যে কাঙাল॥
রাতারাতি বড়োলোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে॥

মায়ের অনুমতি নিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে ঠাকুরদাস কলকাতায় এলেন। পা রাখার একটা জায়গা ছিল। ভরসাস্থল। জ্ঞাতিপুত্র জগমোহন ন্যায়লঙ্কার

মহাশয় কলকাতার সম্মানিত, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁর বৈভবের শেষ নেই। পাণ্ডিত্য, বৈভব, করুণা, তিনটি গুণের মিলনেও দেবোপম। প্রতিদিন বহুমানুষকে অকাতরে অন্নদান।

ঠাকুরদাসের পরিকল্পনাটা ছিল এইরকম—বনমালীপুরে তারপর বীরসিংহে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ তাঁর পড়া আছে। কলকাতায় ন্যায়লঙ্কার মহাশয় যদি কৃপা করে আশ্রয় দেন তাহলে তাঁর চতুষ্পাঠীতে যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষা করবেন। জ্ঞাতিপুত্র বিপন্ন ঠাকুরদাসকে ন্যায়লঙ্কার মশাই অতি স্নেহে আশ্রয় দিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

গভীর রাতে ঘুম আসে না। কোলাহলমুখর অপরিচিত এই শহর। ভিন্ন ঘরকন্যা, ভিন্ন শয্যা। অন্ধকার ঘর। ঘুম আর আসে না। ছ্যার ছ্যার শব্দে ছ্যাকড়া গাড়ি রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে ক্লান্ত ঘোড়া পায়ে পায়ে। মায়ের মুখ চোখে ভাসে। ক্লান্ত, শীর্ণ। আজ গেলে কাল কী হবে জানা নেই। ভাইবোনদের অসহায় মুখচ্ছবি।

না, সংস্কৃত শিখে মায়ের দুঃখ দূর করা যাবে না। শিখতে হবে ইংরিজি। কাজ চলা গোছের ইংরিজি শিখতে পারলেই সাহেবদের সওদাগরি অফিসে চাকরি পাওয়া যায়। ইংরিজি শেখাবার স্কুল তখন ছিল না। পাঠ্যপুস্তকও নেই। সাহেবদের সঙ্গে থেকে থেকে যাঁরা একটু-আধটু শিখেছেন তারাই শেখাতে পারেন। কিছু ইংরিজি শব্দ কণ্ঠস্থ করে রাখতে পারলেই হল। মনের ভাব কোনোরকমে বুঝিয়ে দেওয়া। দু-তিনটে বিশেষ্যপদ আর ক্রিয়াপদ একসঙ্গে বুদ্ধি করে জুড়ে দিতে পারলেই সাহেব বুঝে নিতেন বাঙালিবাবু কী বলতে চাইছে। কতোক ইংরেজি কতোক হিন্দি আর ভাবভঙ্গি।

রথের দিন সরকারবাবু কামাই করেছেন। পরের দিন হৌসে এসেছেন। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, ' কি হল, কাল এলে না কেন?'

সরকার ভেবেই আকুল, রথের ব্যাপারটা সাহেবকে কীভাবে বোঝাবেন! হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। বললেন, 'চর্চ'। বলেই মনে হল, ঠিক হল না। রথের আকৃতি গির্জার মতো হলেও, গির্জা তৈরি হয় ইট দিয়ে, আর রথ তৈরি হয় কাঠ দিয়ে।

তখন সংশোধন করে বললেন, 'উডেন চর্চ'। এইবার বিস্তারিত করছেন, 'থ্রি স্টোরিস হাই', অর্থাৎ তিন-তলা। 'গডআলমাইটি সিট আপন'--জগন্নাথদেব বসে আছে। 'লং লং রোপ', থাউজণ্ড মেন ক্যাচ', 'পুল, পুল, পুল, 'রনাওয়ে

রনাওয়ে', 'হরি হরি বোল —হরি হরি বোল'। সায়েব পরিষ্কার বুঝে গেলেন।'

খুব ভাল ইংরিজি জানে, মানে, হাজার, দুহাজার ইংরিজি শব্দ মুখস্থ করতে পেরেছে। ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের এক বন্ধু এই ধরনের ইংরিজি জানতেন। ব্যবস্থা হল ঠাকুরদাস তাঁর কাছেই ইংরিজি শিখবেন। সেই ভদ্রলোক সকালবেলা তাঁর নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঠাকুরদাসকে বললেন, তুমি সন্ধেবেলায় এসে আমার কাছে ইংরিজি শিখে যাবে।

ঠাকুরদাস সেই অনুসারে, রোজ সন্ধের পর সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে ইংরিজি শেখা শুরু করলেন।

উপবাসের পাঠশালা

ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের বাড়ির নিয়ম ছিল, আশ্রিতদের আহারপর্ব সন্ধের পরেই শেষ হয়ে যেত। পণ্ডিতি ভাষায় 'নক্তন্তন' আহার। ঠাকুরদাস পড়াশোনা সেরে যখন ফিরে আসতেন, খাওয়ার পাট চুকে গেছে। রাত্রে উপবাস। দিন, দিন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছেন ঠাকুরদাস।

ইংরিজি শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বলো তো ঠাকুরদাস, রোগা হয়ে যাচ্ছ, দুর্বল হয়ে পড়ছ। কেন?'

ঠাকুরদাসের চোখে জল, 'আজ্ঞে আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেখানে সন্ধের পরেই আশ্রিতদের আহার শেষ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়টায় আমি আপনার কাছে থাকি। রাতে আমার আহার জোটে না। শুধু এক গেলাস জল।'

শিক্ষকমহাশয়ের এক আত্মীয় পাশে বসে শুনছিলেন। তাঁরও চোখে জল এসে গেছে। তিনি বললেন, 'ঠাকুরদাস! আর তোমার ওখানে থাকা চলে না। তুমি যদি নিজে রেঁধে খেতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় আশ্রয় দিতে পারি।'

ঠাকুরদাসের চোখে দুঃখের অশ্রু আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে রূপান্তরিত হল। পরের দিনই তিনি চলে এলেন সেই সহৃদয় মানুষটির আশ্রয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল সঙ্গতি তেমন ছিল না। এইটাই দুঃখের। পৃথিবীর এইটাই নিয়ম নাকী। হৃদয় থাকলে বিও থাকবে না। বিও থাকলে হৃদয় থাকবে না।

সদাশয় সেই আশ্রয়দাতার পেশা ছিল দালালি। রোজগার অনিয়মিত। কখনো হল কখনো হল না। সাতসকালে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতে ফিরতে দুপুর দুটো কী আড়াইটে। ফেরার সময় বাজার করে আনতেন। কোনো দিন প্রচুর, কোনো দিন যৎসামান্য। কোনোদিন স্বচ্ছন্দে আহার, কোনো দিন অতি কষ্টে। মাঝে মধ্যে দিনের বেলায় তিনি ফিরতে পারতেন না। সেই সেই দিন ঠাকুরদাস সারাটা দিন উপবাসী।

কলকাতায় ঠাকুরদাসের সম্পত্তি বলতে একটি পেতলের থালা, আর একটি ছোটো ঘটি। থালাখানিতে ভাত আর ঘটিতে জল খেতেন। একদিন বসে-বসে ভাবছেন, একপয়সার শালপাতা কিনে রাখলে দশ বারো দিন ভাত খাওয়া চলে যাবে। থালাটা না থাকলে কোনো অসুবিধেই হবে না। তাহলে থালাটা বেচে দেওয়া যাক। হাতে দুটো পয়সা আসবে। যেদিন দিনের বেলা ভদ্রলোক ফিরতে পারবেন না, সেদিন একপয়সার কিছু কিনে খাওয়া যাবে। ভীষণ ক্ষিদে পায় যে!

পেতলের একটি থালা

অভিনব পরিকল্পনার পুলকে পুলকিত ঠাকুরদাস পথে নামলেন থালাখানি বগলে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এলেন চিৎপুরের নতুনবাজারে কাঁসারি পাড়ায়। কাঁসারিরা সন্দেহের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'অচেনা লোকের কাছ থেকে থালা কিনে শেষে কী ফ্যাসাদে পড়ব! থানা, পুলিশ, কোমরে দড়ি!'

দুপুররোদে বৃথাই ঘোরাঘুরি। থালা বিক্রি হল না। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। ক্লান্ত বিষণ্ণ ঠাকুরদাস ফিরে এলেন। উপবাসের ছায়া থেকে বেরোতে পারলেন না। আজ আহার জোটে তো কাল জোটে না। বেলা বাড়ে হাঁড়ি চড়ে না।

একদিন দুপুরে অপেক্ষায় থেকে থেকে যখন দেখলেন ভদ্রলোকের ফেরার সম্ভাবনা নেই, তখন ক্ষিদের জ্বালায় পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথে পথে ঘুরলে মনটা যদি ঘুরে যায়! লোকজন, রাস্তা। দুপুরের শহর। খাইয়েরা হজমের জন্য ভ্রমণে বেরোয়। ঠাকুরদাস খাওয়ার কথা ভোলার জন্যে ভ্রমণে

বেরিয়েছেন। বড়োবাজারের আস্তানা থেকে বেরিয়ে হাঁটছেন। ঠনঠনে পর্যন্ত এসে আর হাঁটতে পারলেন না। মনে হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাবেন। পেটে কিছু নেই, তার ওপর প্রবল তৃষ্ণা।

কলকাতার করুণাময়ী

ঠনঠনিয়া। সোনার জিভ বের করে মা দাঁড়িয়ে আছেন ভিখারি শিবের বুকে। মন্দির বন্ধ। মায়ের এখন বিশ্রামের সময়। মধ্যাহ্নে ছাগ বলি হয়েছে। ভক্তের মানত ছিল। মা মামলা জিতিয়ে দিয়েছেন। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষমাস। একদল ভিখারি কাপড় বিছিয়ে শুয়ে আছে। মন্দিরে মায়ের ঘুম ভাঙলে উঠে বসবে। মায়ের কৃপায় দু-চার পয়সা পড়বে। একজনের গানের গলা আছে। ভক্তিও আছে। ভিখারি নয় বৈরাগী। তিনি গাইছেন,

তোমার কে মা বুঝবে লীলে
তুমি কী নিলে কী ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝ-সকালে।
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য মাপাও যেমন যার কপালে॥

অল্প দূরে ছোট্ট একটি দোকান। মধ্যবয়সি এক বিধবা মহিলা মুড়িমুড়কি বিক্রি করছেন। ঠাকুরদাস দোকানটির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, মুড়ি-মুড়কি, কদমা, বাতাসা। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। পেটে আগুন জ্বলছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুরদাস। তাঁকে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন,

'বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

ঠাকুরদাস বললেন, 'খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। এক গেলাস জল দেবে মা।'

মহিলা সাদরে, সস্নেহে ঠাকুরদাসকে দোকানের ভেতরে ডেকে নিলেন, 'বোসো বাবা, বোসো। আমি জল দিচ্ছি।'

ব্রাহ্মণের ছেলেকে তো শুধু জল দেওয়া যায় না। প্রথমে একমুঠো মুড়কি দিলেন। সামনে রাখলেন এক ঘটি জল। তিনি দেখছেন, ব্রাহ্মণসন্তান গোগ্রাসে মুড়কিগুলো খেয়ে ফেললেন; যেন আরো থাকলে ভালো হত।

মহিলা সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার কিছু খাওয়া হয়নি?'

সেই মমতাময়ী মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন ঠাকুরদাস। বীরসিংহগ্রামে মায়ের কী আহার জুটেছে আজ! ভাই, বোনরা কী খেতে পেয়েছে! মায়েরা কী সর্বত্রই মা। তাই কী মন্দিরে মা বরাভয় ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন? মুড়ি-মুড়কির দোকান সাজিয়ে বসে আছেন মা। মুখ দেখে বুঝতে পেরেছেন, সন্তান অভুক্ত।

ঠাকুরদাসের চোখে জল। এই বিদেশ বিভূঁয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন করুণাময়ী।

'না মা, আজ এখনো পর্যন্ত আমার আহার জোটেনি। কিছুই খাইনি মা।'

মহিলা তীব্র গলায় আদেশ করলেন, 'দাড়াও। জল খেয়ো না। একটু অপেক্ষা কর। আমি এখুনি আসছি।'

মহিলা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন দোকান ছেড়ে। ঠাকুরদাস বসে আছেন। সামনে এক ঘটি জল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন। হাতে বড়ো এক ভাঁড় দই। কিছু দূরে ময়রার দোকান। নগদ পয়সায় দই কিনে এনেছেন। মুঠো-মুঠো মুড়কি ঢাললেন। ঠাকুরদাসের সামনে ধরে বললেন, 'খাও বাবা খাও। পেট ভরে খাও। আহা! মুখটা শুকিয়ে গেছে!'

ঠাকুরদাস পেট ভরে ফলার করলেন। জল খেলেন। আঃ, কী তৃপ্তি!

মহিলাও যেন তৃপ্ত। প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ব্যাপারটা কী, আমাকে খুলে বল।'

ঠাকুরদাস সংক্ষেপে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সেই মাকে বললেন।

সব শুনে তিনি বললেন, 'শোনো বাবাঠাকুর, যেদিন তোমার এই রকম হবে তুমি তোমার এই মা-টার কাছে চলে আসবে। ফলার করে যাবে। জেনে রাখো, এই শহরে তোমার একজন মা আছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখলেন, 'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনোই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।'

মাঝে মাঝেই বড়বাজারের সেই ভদ্রলোক দুপুরে ফিরতেন না। ঠাকুরদাস নিঃসঙ্কোচে চলে আসতেন ঠনঠনিয়ার মায়ের কাছে। ফলার করে ফিরে যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ওই মাকে বলেছেন, দয়াময়ী।

যেমন তেমন একটা চাকরি

ঠাকুরদাস মাঝে, মাঝেই তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলতেন 'যে ভাবেই হোক আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন। দেশের বাড়িতে তারা যে সব উপবাসে দিন কাটাচ্ছে। আমি যে তাদের খাওয়াব বলে কলকাতায় এসেছিলুম। আমি ধর্মপ্রমাণ বলছি—যাঁর কাছে নিযুক্ত হব প্রাণপণে পরিশ্রম করে তাঁকে সন্তুষ্ট করব। প্রাণান্তেও অধর্মাচরণ করব না। এমন কিছু করব না, যাতে আপনার বদনাম হয়। দেশের কথা মনে পড়লে আর আমার এক মুহূর্তও বাঁচতে ইচ্ছে করে না।' ঠাকুরদাস বলছেন আর কাঁদছেন।

আশ্রয়দাতার কৃপায় ঠাকুরদাস একজায়গায় নিযুক্ত হলেন। মাইনে, মাসে দুটাকা। কী আনন্দ। দেশের বাড়িতে পরিবারবর্গের সেবায় জ্যেষ্ঠপুত্রের সামান্য অবদান। যে কারণে সব ছেড়ে কলকাতায় আসা। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করা।

পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, অতিকর্মতৎপর, সৎ, আন্তরিক ঠাকুরদাস যখন যেখানে কাজ করেছেন সেখানেই কর্মদাতার প্রশংসা অর্জন করেছেন। দুটাকা থেকে মাইনে বেড়ে দাঁড়াল মাসিক পাঁচ টাকা। দেশে মা আর ভাইবোনদের কষ্ট অনেকটাই দূর হল। বলা যায়, সুসময় বুঝি এল।

পাঁচ টাকা তখনকার কালে অনেক টাকা। আট আনা, দশ আনায় এক মন চাল। এক টাকায় এক মন দুধ। শাক-সবজি, তরিতরকারি গ্রামের মানুষকে কিনতে হত না। সেকালের দরিদ্র মানুষ টাকা প্রায় দেখতেই পেত না। দেখার দরকারও হত না। প্রকৃতির দানে দিন চলে যেত।

কে এই ছন্মবেশী

বনমালীপুরের বাড়িতে এক অচেনা মানুষ। এই বাড়িতেই তো তারা ছিল। গেল কোথায়? সে কি জানে না? দুর্গা অনেকদিন আগেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কী করবে যার স্বামী ওই রকম।

মানুষটি বীরসিংহে এলেন। আধা ফকির। অমন কত আসে। পথ থাকলেই পথিক আসবে। এক ঠাঁইয়ের মানুষ আর এক ঠাঁয়। হাটে, ঘাটে, মাঠে ইচ্ছে

মতো ঘুরবে। ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। যেমন হঠাৎ এল, সেইরকম হঠাৎ আবার চলে গেল।

এই মানুষটির অন্য কোনোরকম উদ্দেশ্য আছে কি? তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের কন্যা দুর্গাদেবীর কুটিরের দিকে নজর আছে যেন। আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে কী দেখেন অতো! সন্ন্যাসীর মতো এই মানুষটির অসৎ কোনো উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষ খুঁজে পেলেন না। হয়তো কৃপা করবেন। দুঃখী মায়ের কপাল ফিরবে। লক্ষণ তো শুরু হয়েছে। বড়ো ছেলে চাকরি পেয়েছে কলকাতায়।

দুর্গা দেবীর ছোটো মেয়ে অন্নপূর্ণা সেই সাধুকে প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরে, বাবা বাবা বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। ধরা পড়ে গেলেন রামতর্কভূষণ। চোখের জলের নাটক। কত বছর পরে ফিরে এলেন ঠাকুরদাসের পিতা!

রামজয় তর্কভূষণ প্রব্রজ্যা থেকে ফিরে এলেন কেন? বেশতো তীর্থে তীর্থে যোগির জীবন অতিবাহিত করছিলেন। আট বছর পরে ফিরে এলেন। দ্বারকা, জ্বালামুখী বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করেছিলেন। অসীম সাহসী, বলশালী। ভয় তাঁকে ভয় পেত। তাঁর হাতে থাকত একটি লৌহদণ্ড। যখনই বাড়ির বাইরে বেরোতেন, দণ্ডটি হত তাঁর সঙ্গী। সেই একটা সময়। পথে সর্বসময় ভীষণ দস্যুভয়। রোজই দু'চারজন পথিকের মৃত্যু হত। একা পথিক সম্পূর্ণ অসহায়। কোথাও যেতে হলে, যেতে হত দল বেঁধে, লাঠিসোঁটা নিয়ে, সাহসে বুক বেঁধে।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর এই অসীম সাহসী পিতামহ সম্পর্কে লিখছেন, 'কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই-চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেল-সেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না।'

শুধু বদ-মানুষ নয়, বন্য-প্রাণীও তাঁর দণ্ডের শাসনে জব্দ হত। তখন তাঁর বয়স একুশ। একা চলেছেন মেদিনীপুরে। সেই সময় ওই অঞ্চলে গভীর জঙ্গল। বাঘ, ভালুক, হিংস্রজন্তুর বিচরণ, ভূমি। একটা খাল পড়ল জঙ্গলের পথে। সেটা পর হওয়া মাত্রই বেরিয়ে এল একটা ভালুক। জাপটে ধরল রামজয়কে। ধারাল নখ নিয়ে সারা শরীর ফালা-ফালা করতে লাগল। রামজয় ছাড়ার পাত্র নন। লোহার দণ্ড দিয়ে ভালুকটিকে পিটিয়ে চলেছেন অবিশ্রান্ত। ভালুক

ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। তখন প্রকাণ্ড এক পদাঘাতে প্রাণসংহার।

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত রামজয় অবসন্ন হয়ে আসছেন। মেদিনীপুর তখনও আট মাইল দূরে। অনায়াসে সেই পথ পেরিয়ে মেদিনীপুরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছলেন। সেখানে দু'মাস শয্যাশায়ী। সমস্ত ক্ষত শুকোবার পর ওই পথেই ফিরে এলেন। সারাজীবন দেহে বহন করেছিলেন নখরাঘাতের গভীর ক্ষতচিহ্ন।

মানুষ পৃথিবীতে এসে খড়কুটোর মতো সময়ের নদীতে ভেসে ভেসে চলে যায়। রামজয় তাঁর পা দুটিকে পৃথিবীর ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। মানববৃক্ষের মতো বর্ধিত হয়েছিলেন ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে। একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন, আমার পৃথিবী। অরণ্য, নদ-নদী, পর্বত, তীর্থভূমি, সব আমার। চর্তুদিকে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর মানুষ। তাঁর শ্যালক, গ্রামের প্রধানেরা মানুষের মতো দেখতেই, কেউ মানুষ নয়। এমন কোনো কাজ নেই, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যা তাঁরা করতে পারেন না। সময় সময় তাঁরা নির্বোধের মতো এমন সব কাজ করতেন, যা দেখলে মনে হত, এঁদের ঘটে বুদ্ধি-বিবেচনা কিছু আছে কী। তর্কভূষণমশাই সেই কারণেই সবসময়, সকলের সামনে হেঁকে ডেকে নির্ভয়ে বলতেন—'এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সকলেই গরু।'

একদিন তর্কভূষণমশাই মাঠের যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন, সেই দিকে গ্রামের মানুষ প্রাতঃকৃত্য করে। গ্রামের এক মাতব্বর তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে বলছেন,

'তর্কভূষণমশাই ওই দিকটা দিয়ে যাবেন না।'

তর্কভূষণ বললেন, 'কেন? দোষ কী?'

তর্কভূষণমশাই চারপাশ ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি তো গোবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যে গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সেখানে বিষ্ঠা আসবে কোথা থেকে।'

সেই গ্রাম আছে, সেই ভূমিও আছে। সেইসব মানুষদের উত্তরপুরুষরাও আছেন। সেই সকালটা নেই। তেজস্বী সেই মানুষটির নিষ্ঠুর এই বিদ্রুপ ইথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কাল থেকে কালান্তরে চলে এসেছে। 'মানুষ কোথায়!'

নিষ্ঠাবান, তেজস্বী, অকুতোভয়, মহাসাধক এই মানুষটিকে ঋষিতুল্য জ্ঞানে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। তীর্থ ভ্রমণকালে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন, 'রামজয়! এইবার তুমি পরিবার পরিজনের কাছে গৃহে ফিরে যাও। অপেক্ষা করে

থাকো। তোমার বংশে শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা এক মহাপুরুষের আগমন হবে। বংশের মুখ, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। সে হবে দয়ার অবতার। অবিলম্বে দেশে ফিরে গিয়ে পরিবার রক্ষা কর। পরিবারই মহাপুরুষদের আবির্ভাব-ভূমি। সাত্ত্বিক ক্ষেত্র ছাড়া তাঁরা আসেন না। তিনি আসবেন, তোমরা গ্রহণ করো স্রষ্টার এই দান। পালন করো। রক্ষা করো।'

প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে প্রকম্পিত চারিদিক

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই সাধক রামজয় ছেলেকে খবর দেবার জন্যে পথে নেমে হাটের দিকে ছুটেছিলেন। এঁড়ে বাছুরটির আবির্ভাব হল রে ঠাকুরদাস। রসিক পণ্ডিতের রসবোধের উক্তি।

'তোমরা দাঁড়াও। এই মুহূর্তে আমার করণীয় কিছু কাজ আছে।'

রামজয় সদ্যোজাত শিশুটির কাছে এগিয়ে গেলেন। ছোট্ট মুখে, ছোট্ট এতোটুকু জিভ। জিভের তলায় আলতা দিয়ে কিছু লিখে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'শোনো তোমাদের কালের কথা শুনিয়ে যাই। পরে মিলিয়ে নিয়ো। এই শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজিত করবে, এর প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চতুর্দিক কম্পিত হবে, এর দয়া-দাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হবে। আমিই এর দীক্ষাগুরু হলাম। এই বালক অন্য আর কোনো গুরু গ্রহণ করবে না; আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হল, আমার বংশ পবিত্র হল।'

এ তো পরের ঘটনা। তার আগে! রামজয় হঠাৎ ফিরে এলেন। কেন এলেন। তখন বললেন না। গৃহী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী আবার গৃহী হলেন। এমন হয়। অনেক সময় বৃহত্তর কারণে সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাস ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসতে হয়।

প্রায় আটবছর পরে প্রত্যাবর্তন। পরিবার পরিজনের মহানন্দ। যেন উৎসব! পিতার প্রত্যাবর্তন। শ্বশুরবাড়ির গায়ে গা লাগিয়ে এই বসবাসের তিনি ঘোরতর বিরোধী। আমরা আমাদের জায়গা বনমালীপুরে থাকি না কেন! দুর্গাদেবী বললেন, সে অসম্ভব। তোমার ভাইদের অত্যাচারে ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।

ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখলেন, 'সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী

ভ্রাতাদের অধিকদিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না; যিনি সংসার কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বাচ্ছন্দে থাকেন অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে সেরূপ সুখে ও স্বাচ্ছন্দে থাকা কোনও মতে ঘটিয়া উঠে না। এজন্য অল্পদিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে, অবশেষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়।'

ঈশ্বরচন্দ্র নানা কারণে একান্নবর্তী পরিবারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন 'যেখানে পুরুষ স্ত্রীর কথায় মরে বাঁচে, সেখানে সহোদরে-সহোদরে আত্মীয়তা থাকে না। এমন অবস্থায় আর একান্নবর্তিতা রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা বৃথা। যাহারা দূরে আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া অশান্তির আগুনে দগ্ধ করা অপেক্ষা, যাহারা একত্রে আছে তাহাদের কোনো প্রকার মনোমালিন্য ঘটিবার পূর্বেই পৃথক-পৃথক বাস করা শ্রেয়ঃ, কারণ তাহা হইলে, সহোদর আর কখনো সহোদরের শত্রু হইবে না। অশান্তিপূর্ণ সংসারে লক্ষ টাকাতেও কাহারও কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে।'

বীরসিংহ গ্রামে তবে থাকা যাক—এই সিদ্ধান্তে এলেও রামজয় খুব খুশি হতে পারলেন না। শ্যালক রামসুন্দর গ্রামের প্রধান। গর্বিত, উদ্ধত স্বভাব। যেন রাজাধিরাজ। ভেবেছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁর অনুগত থাকবেন। রামজয় শ্যালক রামসুন্দরের তাঁবেদার হবেন! অসম্ভব ব্যাপার। রামসুন্দরের মোসায়েবরা মাঝে মধ্যেই রামজয়কে ভয় দেখাতেন—অনুগত না হয়ে চললে আপনি সমূহ বিপদে পড়বেন তর্কভূষণমশাই। রামজয় কী ভয় পাওয়ার মানুষ! তিনি মুখের ওপর বলে দিতেন, শালার বশীভূত হয়ে থাকার চেয়ে এখানকার বাস উঠিয়ে দেবো বরং। শ্যালকের আক্রোশে তাঁর প্রায় একঘরে হওয়ার অবস্থা। নানা অত্যাচার, বহু উপদ্রব। ব্রাহ্মণ কিন্তু শান্ত, অবিচল। আমি মাথা নত করব না। অনাদর, অপমান সহ্য করব না। আমি আমার মতে চলব! কারো উপকারের আমি তোয়াক্কা করি না। অন্যের ভজনার চেয়ে প্রাণত্যাগ ঢের ভালো। নির্বোধের দলের তাণ্ডবের মধ্যে রামজয়ের অবস্থান।

কলকাতায় রামজয়

কয়েকদিন বাড়িতে কাটাবার পর পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখার জন্যে উতলা রামজয় কলকাতা যাত্রা করলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনে রামজয় ভীষণ খুশি হলেন। আট বছর তিনি ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরদাস নিজেকেই নিজে মানুষ করেছে। কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়পরায়ণ। বাপ কা বেটা।

বড়বাজারের বড়োলোক ভাগবতচরণ সিংহ। রামজয়ের পূর্বপরিচিত। সিংহমহাশয় অতি দয়ালু। ধার্মিক। রামজয়ের মুখে তাঁর দেশত্যাগ, নানা দেশভ্রমণ, তীর্থ- দর্শনের দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনে পুলকিত হলেন। বললেন, 'আমার বাড়ি থাকতে ঠাকুরদাস অন্য জায়গায় থাকবে কেন? সে এখানে থাকবে।'

পিতার নির্দেশে ঠাকুরদাস সিংহমহাশয়ের আশ্রয়ে চলে এলেন। ধনী মানুষ। ধর্মপরায়ণ, দাতা। ঠাকুরদাসের সকল ক্লেশের অবসান। যেন পুনর্জন্ম হল। জীবন ঘুরে গেল। সৌভাগ্যের উদয়। দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার সুযোগ। এ কী কম কথা! শুধু অন্নকষ্ট দূর হওয়া নয় সিংহমশাইয়ের সুপারিশে নতুন জায়গায় চাকরি হল, মাইনে আট টাকা। বিরাট সংবাদ। দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রইল না। এতদিন পরে জীবনের কাল মেঘ কাটল বুঝি। ভাগ্যসূর্যের প্রসন্ন উদয়।

টোপর মাথায় দিয়ে

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ঠাকুরের বয়েস কত হল?'

দুর্গাদেবী বললেন, 'তেইশ কী চব্বিশ।'

'তাহলে তো লক্ষ্মী আনার সময় হল।'

গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবী। রূপে যেন অন্নপূর্ণা। পিতা বর্তমান তবু কেন মাতুলালয় প্রতিপালিত। অদ্ভুত সেই ইতিহাস। ভগবতীদেবীর পিতা রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় গোঘাটের এক নামি মানুষ। বুদ্ধিমান, মেধাবী, অত্যন্ত পরিশ্রমী। এই তিনটি গুণেই মানুষের ভাগ্য তৈরি হয়। অবাধ অধ্যয়নে একুশ-বাইশ বছর বয়সেই ব্যাকরণে আর স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি এবং তর্কবাগীশ উপাধি লাভ। একটি চতুষ্পাঠী

স্থাপন করলেন। বহু ছাত্র। অন্নদান ও শিক্ষাদান। গুরু-শিষ্যপরম্পরা। দিকে দিকে সুনাম।

পাতুলের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ এই সুপাত্রকে তাঁর জামাতা করলেন। জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বিবাহ হল রামকান্তের। যেন রাজযোটক। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ বিখ্যাত পণ্ডিত। বাড়িতে বিশাল চতুষ্পাঠী। বৃহৎসম্পন্ন পরিবার। চার ছেলে, দুই মেয়ে গঙ্গা আর তারা।

গঙ্গাদেবীর সংসারে অভাব নেই। তাঁর স্বামীর যথেষ্ট রোজগার। প্রভূত প্রতিপত্তি। সুখের সীমা নেই। যথাকালে তাঁর দুটি কন্যা হল। বড়ো-লক্ষ্মী। ছোটো-ভগবতী।

এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই। কোথাও মেঘ নেই। সুনীল আকাশ। এই বার বিপর্যয়। ঢুকছে ধর্মের পথ ধরে।

মঞ্জুর

রামকান্ত তর্কবাগীশের মাথায় ঢুকল তন্ত্রসাধন। তন্ত্রসাধনা করবেন। তান্ত্রিক হবেন। শুরু হল শাস্ত্র ধরে সাধনা। এমন মেতে গেলেন চতুষ্পাঠী বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্ররা সব বাড়ি ফিরে গেল রামকান্তের তাতে দুঃখ হল না, বরং আনন্দিত। নির্বিঘ্নে সাধনা করতে পারবেন।

এই কাহিনি স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের মুখেই শোনা যাক। লিখছেন, 'তর্কবাগীশ মহাশয় অবশেষে শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে তুনি তুড়ি দিয়া 'মঞ্জুর' বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন।'

এরপর তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তুড়ি মেরে একটি কথাই বলতেন, 'মঞ্জুর'। আর কোনো কথা নেই। চুপ। এরপর দেখা গেল তিনি বসে থাকতে থাকতে তুড়ি মেরে বলছেন, 'মঞ্জুর' 'মঞ্জুর'। সংসারে রামকান্তের ভাই বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। একেবারে একা। গঙ্গাদেবী দুটি শিশুকন্যা ও পাগল স্বামীকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। খবর দিলেন পিতাকে।

বিদ্যাবাগীশমশাই, মেয়ে, জামাই আর দুই নাতনিকে নিজের কাছে নিয়ে

এলেন। উন্মাদ জামাতার থাকার স্থান হল চন্ডীমণ্ডপে। প্রচুর চিকিৎসা করালেন। হল না কিছুই। বোঝা গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা অসম্ভব। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি অতি আদরে তাঁর কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ডাক এসে গেল। তিনি চলে গেলেন। সংসারের কর্তা হলেন, বড়োছেলে রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। মেজভাই রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা শুরু করলেন। পরের দুইভাই গুরুপ্রসাদ আর বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ব্যবসা করতেন। সমস্ত রোজগারের টাকা জমা পড়ত বড়দার কাছে। তিনি ছিলেন সমদর্শী, ন্যায়পরায়ণ। চার ভাইয়ের মধ্যে কোনো দিন মনোমালিন্য হয়নি। চিরকাল একান্নবর্তী থেকে সুখে সংসারধর্ম পালন করেছিলেন এই দেব পরিবার।

ভগবতী

[রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার পরিশোধ হইতে পারে না]

ঠাকুরদাসের পিতা দেখলেন অন্নপূর্ণাকে। পণ্ডিত পিতা শবসাধনায় উন্মার্গগামী। শ্বশুরালয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে, থেকে থেকে তুড়ি মারছেন, আর একটি শব্দই উচ্চারণ করছেন—'মঞ্জুর'।

সম্প্রদান করলেন মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। ঠাকুরদাস সালঙ্কারা ভগবতী- দেবীর পাণিগ্রহণ করলেন—ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তনন্ চিত্তং তেহস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্ত মহাম।

গোঘাট থেকে পালকি এল বীরসিংহ গ্রামে। নামলেন ঠাকুরদাস আর সহধর্মিণী ভগবতী। রামজয় তর্কভূষণ দেখছেন 'ভবিষ্যতের' প্রবেশ। ওই মহামানব আসে। আজ যা স্বপ্ন, কাল তা বাস্তব। তার দীক্ষা হবে আমার কাছে। ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোদসি।

বন্দ্যোপাধ্যায় আর মুখোপাধ্যায় পরিবারের মিলন। দুই সাধকের ধারা। ঠাকুরদাসের পিতা পরিব্রাজক সাধক। ভগবতীদেবীর পিতা তান্ত্রিক, শবসাধক। দুজনেই ভাগ্যচক্রে মাতুল পরিবারে প্রতিপালিত। ঠাকুরদাসের মাতুল কংসতুল্য, ভগবতীদেবীর মাতুলালয় যেন বৃন্দাবন।

বিখ্যাত বিদ্যাসাগরমশাইকে পরবর্তীকালে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হবে 'রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষপ্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয় যাইতেন, এবং একযাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ-ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুত ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ির পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর (লক্ষ্মী) মৃত্যু হইলে তদীয় একবর্ষীয় সন্তান, বিংশতিবৎসর বয়স পর্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।'

করুণার সাগর, দয়ার সাগর, বিদ্যাসাগরকে যিনি ধারণ করবেন, পথ করে দেবেন এই পৃথিবীতে তাঁকে তো সেইরকমই হতে হবে। সাগরকে সাগরই ধারণ করতে পারে। মাতুলালয়ের পরিবেশ, শিক্ষা, নিয়ত দান-ধ্যান, উদারতা, শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদাহরণ ভগবতীদেবীকে মাতা ভগবতীদেবীতে পরিণত করেছিল। ঠাকুরদাসের দেবী লাভ হল। দয়াবতী এলেন সংসারে।

সেকালের সমাজের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, 'আত্মীয়স্বজনের সেবা, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভারগ্রহণ, মৃত আত্মীয়স্বজনের অনাথ ও নিরাশ্রয় পুত্রকন্যার লালনপালনই এই পরাধীন ও প্রাণহীন বঙ্গসমাজের পরম সম্পদ ও অমূল্যধন বলিয়া চিরকাল কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। এমন একসময় ছিল যখন লোক বিষয়-সম্পত্তি লাভ ও অর্থোপার্জন করিয়া কেবল নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে আত্মীয়স্বজন ও অপর দশজনের সুখ বর্ধন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দশজনের সেবা করাই ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।'

যথাকালে ঈশ্বরচন্দ্র এলেন। পিতামহের রসিকতার এঁড়ে বাছুরটি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতকারের এই ব্যাখ্যাটি তুলনাহীন। 'সুকঠিন প্রস্তরময় পর্বতদেহে সুমিষ্ট সলিলধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমতলক্ষেত্র স্নিগ্ধ করে উর্বর করে, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃকুলের ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার শেলবক্ষে তাঁহার মাতৃকুলের দেবদুর্লভ লোকসেবার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসমাজকে উর্বর করিয়াছে— মিষ্ট করিয়াছে।'

প্রৌঢ় ঈশ্বরচন্দ্র খ্যাতির শীর্ষে বসে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এদিকটা যত ধূসর ও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, ওদিকটা তত স্পষ্ট হচ্ছে। তাই হয়। বীর- সিংহ গ্রামের বন, উপবন, ধানক্ষেত, জলাশয়। সেই দুরন্তপনা। কেন এত দুরন্ত ছিলুম! প্রতিবেশীদের কতই না উত্যক্ত করেছি।

আমার জন্মের পর আমাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা, সেই কারণেই আমার খুব খাতির। আর তাই কী আমার সীমাহীন দুষ্টুমি। মনে পড়ে, সবাই একবাক্যে বলতে লাগলেন, এই দুরন্তপনা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সে সব রকম রকম কাণ্ড। কী করে যে মাথায় আসত। সবার চেয়ে আকারে বড়ো আমার এই মাথাটাই জানে!

সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন, ছেলেটাকে পাঠশালায় পাঠানো যাক। সেই গুরুমহাশয়ের কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পাঠশালা খুলেছিলেন। পড়ুয়ারা সবাই যেন তাঁর আপন সন্তান! এমন স্নেহময় গুরুমশাই সহসা দেখা যায় না। ছেলেদের পড়ার ইচ্ছেটা তিনি এমনভাবে বাড়িয়ে দিতেন, সবাই খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে ফেলত। পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়ের দলের আদর্শ ছিলেন।

তখন আমার বয়স পাঁচ। এক বছর পড়ার পর বাংলার যাবতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হলুম। প্রথমে কিছুকাল জ্বর। তারপর উদরাময়, তারপর পরিণত প্লীহা ও আনুষঙ্গিক জ্বর। সাঁড়াশি আক্রমণ। শীর্ণ, দুর্বল শরীর। সবাই জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। ঈশ্বর কী ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে চাইছে!

আমার মায়ের বড়োমামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ খবর পাঠালেন, ঈশ্বরকে নিয়ে এসো আমার কাছে। তাঁর বাসগ্রাম পাতুলের কাছে কোঠরীগ্রামে নামকরা কবিরাজের বসবাস। রামগোপাল কবিরাজ আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। তাঁর সুচিকিৎসায় ছয় মাসে সম্পূর্ণ রোগমুক্তি।

বীরসিংহে ফিরে এলুম। সঙ্গে নিয়ে এলুম সুস্থ শরীর আর মায়ের মামার বাড়ি সম্পর্কে অভিভূত করার মতো চিরকালের স্থায়ী এক স্মৃতি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও তাঁর পরিবারবর্গের নির্মল-স্নেহ আর অকুণ্ঠ-যত্নের অভিজ্ঞতা। তাঁরা মানুষ না দেবতা!

আবার গুরু কালীকান্ত মহাশয়ের পাঠশালা। গুরুমশাই আমাকে ভীষণ

ভালোবাসতেন। সকলের কাছে আমার খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন ঈশ্বরের মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। দুরন্ত, কিন্তু শেখার আগ্রহ অসীম।

মনে পড়ে, অন্য পড়ুয়ারা বাড়ি চলে যাওয়া পরেও গুরুমশাই আমাকে মুখে মুখে যা শেখানো সম্ভব শেখাতেন। কী তাঁর আগ্রহ। শেখো শেখো আরো শেখো। তারপর আমাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

গুরুমশাই ঠাকুরদাসকে বললেন, ঈশ্বর পাঠশালা শেষ করে দিয়েছে। হাতের লেখা অতি সুন্দর। মেধাবী, পরিশ্রমী। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয়। ঈশ্বর পারবে।

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ পরলোক পাড়ি দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বড়ো হবে, বিখ্যাত হবে তিনি জানতেন। তিনি বলেছিলেন। তাঁর কাল ফুরিয়ে গেল। তিনি উপর থেকে দেখবেন।

মাইল স্টোন বিজয়

পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসছেন। সঙ্গে আসছেন পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। আসছেন হাঁটা-পথে। অহল্যাবাঈ রোড আরামবাগের মাঝখান দিয়ে কলকাতাগামী। শিয়াখালা থেকে শুরু হল সালিখার পাকারাস্তা।

পাকারাস্তায় উঠে ঈশ্বরচন্দ্র দেখছেন। বাটনা বাটা শিলের মতো এক একখানা পাথর মাঝে মাঝে পথের ধারে বসানো রয়েছে। বালকের খুব কৌতূহল। পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন 'বাবা, পথের পাশে মাঝে মাঝে শিল পুঁতে রেখেছে কেন?'

ঠাকুরদাস হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবা, ওগুলো শিল নয়, ওকে বলে মাইল স্টোন।'

'মাইল স্টোন কি জিনিস?'

'ওটা ইংরিজি কথা। এক মাইল আমাদের হিসেবে আধক্রোশ। আর স্টোন শব্দের মানে পাথর। প্রত্যেক আধক্রোশ অন্তর ওই রকম এক একটি পাথর পোঁতা আছে। কলকাতা আর কতটা দূরে এই পাথরের গায়ে যে সংখ্যা লেখা আছে, সেই সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে। এই দেখ, এই পাথরের গায়ে লেখা আছে উনিশ। তার মানে কলকাতা এখনো উনিশ মাইল বা সাড়ে নয় ক্রোশ দূরে।'

ঈশ্বরচন্দ্র খুব ভালো করে দেখে বললেন, ' তাহলে এই সংখ্যাটা হল ইংরিজির এক, আর এইটা নয়।'

ঠাকুরদাস বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করে ফেললেন পথে যেতে যেতেই ইংরিজি অঙ্ক শিখে ফেলবেন। উনিশের পর আসবে আঠারোর আট। সতেরো সাত। উনিশ থেকে দশ পর্যন্ত এসে ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বললেন, 'বাবা, আমার ইংরিজি অঙ্ক শেখা হয়ে গেল।'

এ কী বিশ্বাসযোগ্য! ঠাকুরদাস পরীক্ষা শুরু করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাইল স্টোন পড়ছেন আর বলে যাচ্ছেন, এই তো নয়, এটা আট, এই হল সাত। তবু সন্দেহ গেল না। নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত এইভাবে চালাকি করেও তো বলা যায়। চালাক ছেলেরা তাই করবে।

ঠাকুরদাস একটা চালাকি করলেন। কথায় কথায় ঈশ্বরচন্দ্রকে ছয় লেখা মাইলস্টোনটি দেখতে দিলেন না। পাঁচে এসে ছেলেকে বললেন, বল, কী লেখা আছে?' ঈশ্বরচন্দ্র একনজর দেখেই বললেন, 'বাবা, ওরা ভুল করে ফেলেছে হবে ছয়, লিখেছে পাঁচ।'

ঠাকুরদাস মহানন্দে বললেন, ' বাঃ, বাঃ! তোমার ইংরিজি অঙ্ক সত্য সত্যই শেখা হয়েছে। ছয়টা তোমাকে আমি দেখতে দিইনি।'

গুরুমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছাত্রের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেশ বাবা বেশ!'

ঠাকুরদাসকে বললেন, 'ঈশ্বরের লেখাপড়ার ভালো ব্যবস্থা করবেন। কালে এ খুব বড়ো হবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

কলকাতা এসে গেল! ভাগবতচরণ সিংহ পরলোকগমন করেছেন। সংসারের কর্তা হয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্র জগদুর্লভ সিংহ। পিতাপুত্র বড়োবাজারে সেই আশ্রয়দাতা অন্নদাতার বাড়িতেই উঠলেন। জগদুর্লভের বয়স সবে পঁচিশ। পিতার আমলের ঠাকুরদাসকে তিনি কাকা বলতেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে দাদা আর তাঁর দুই বোনকে বড়দি আর ছোটদি বলে ডাকতেন।

'বড়োবাজারের এই সিংহ পরিবার আমার মনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে গেছে। এই পরিবারে থেকে আমার কোনোদিন মনে হয়নি যে আমি পরের বাড়িতে আছি। প্রত্যেকেই যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু ছোটদি রাইমণির অদ্ভুত অদ্ভুত

যত্ন আমার মনে চিরকালের অক্ষয় স্মৃতি। তাঁর একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার সমবয়স্ক ছিলেন। ছেলে গোপাল তাঁর কাছে যতটা আদরের ছিলেন। আমিও ঠিক ততটাই আদরের ছিলুম। রাইমণির মতো রমণী আমি দ্বিতীয় আর দেখিনি। ওই স্নেহ, সৌজন্য, সদ্বিবেচনা, অমায়িকতা। আমার হৃদয়মন্দিরে এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি দেবীমূর্তির মতো প্রতিষ্ঠিত। সদা বিরাজমান। তাঁর কথা যখনই মনে পড়ে তখনই চোখে জল আসে। সবাই বলেন, আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী, সে কথা মিথ্যা নয়। যে-ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেছে, এই সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হয়েছে, সে যদি স্ত্রী-জাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহলে আমি বলব তার মতো কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নেই।

'পিতামহী আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন, আমিও যে তাঁর একান্ত অনুগত ছিলাম। কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম মনে হত, এ আমি কোথায় এসেছি। কোথায় আমার বীরসিংহ! গাছপালা, নদী, দিঘি, বাল্যবন্ধুরা, ঠাকুমা, মা! নিজের জায়গা ছেড়ে পরবাসী। নির্জনে বাস চোখের জলে ভাসা। দয়াময়ী রাইমণি না থাকলে, কী হত আমার! আমার জীবনে রাইমণি এক জীবন্ত মন্দির। সেখানে দেবালয়ের শান্তি, আশ্রয়, নির্ভরতা।'

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের মাইনে বেড়ে গেল দুটাকা—আট টাকা থেকে দশ টাকা হল। বৈঠকখানায় সকালবেলা জগদুর্লভবাবু আর ঠাকুরদাস হিসেব নিয়ে বসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে। ন'বছর বালকের কৌতূহল।

কতকগুলো ইংরিজি বিল মিলিয়ে মিলিয়ে ঠিক দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠলেন। 'বাবা! আমিও, আমিও ওইসব ঠিক দিতে পারি।' জগদুর্লভবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বর, তুমি কি ইংরিজি জানো?' ঈশ্বর বললেন, 'দেশ থেকে আসার সময় মাইলস্টোন দেখে দেখে ইংরিজি অঙ্ক শিখে গেছি। আমি ঠিকের কাজ বেশ করতে পারি।'

ঠাকুরদাস আর জগদুর্লভ, দুজনেরই কৌতূহল হল। পরীক্ষা করার জন্যে কয়েকটি বিল ঈশ্বরকে দিলেন, 'দেখি মেলাও।'

ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঘরে আরো কয়েকজন ছিলেন।

সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই বালকের প্রতিভা আরো বিকশিত করার জন্যে যথেষ্ট ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠাকুরদাস বললেন, 'ভাবছি হিন্দু কলেজে দেব।'

'আপনার আয় তো মাত্র দশ টাকা!'

দৃঢ়চেতা ঠাকুরদাস দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ঈশ্বরের পড়ার জন্যে মাসে পাঁচটাকা মাইনে দেব, আর বাকি পাঁচ টাকা বাড়ি পাঠাব সংসার খরচের জন্যে।'

. অর্থাভাবে ঠাকুরদাসের লেখাপড়া যথেষ্ট এগোয়নি, যেভাবেই হোক ঈশ্বরের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করবেনই। শিবচরণ মল্লিক, ধনী সুবর্ণ বণিক। তাঁর সদর বাড়িতে একটি পাঠশালা আছে। সিংহভবনের কাছেই। গুরুমহাশয়ের নাম স্বরূপচন্দ্র দাস। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম যথেষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হলেন। তিন মাসেই পাঠশালার পাঠ সম্পূর্ণ হল। এইবার ভর্তি হতে হবে ভালো কোনো বিদ্যালয়ে। চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ফাল্গুনের প্রথম। বসন্ত এসেছে। কলকাতার কোকিলেরা সরব। হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কলকাতার জল। রক্তাতিসার—ব্লাড ডিসেন্ট্রি। পল্লীর দুর্গাদাস কবিরাজ চিকিৎসা শুরু করলেন। অসুখ না কমে বেড়ে চলল। রাইমণির প্রাণঢালা সেবা। খবর পেয়ে বীরসিংহ থেকে ছুটে এলেন পিতামহী। ঈশ্বরচন্দ্র উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে ফিরে এলেন বীরসিংহে।

পিতার কোলে চেপে

তাঁর নাম শচী। ব্রাহ্মণ-কন্যা। নিজের অর্থে বীরসিংহের উত্তর প্রান্তে বিরাট একটা পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। গ্রামের মানুষ ওই পুষ্করিণীকে বলতেন, 'শচীবামনী।' তার তীরে বালকদের খেলাধুলা। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয় স্থান। তাঁর বালক- বন্ধুদের মধ্যে গদাধর দেহের আয়তনে সবচেয়ে বলশালী। শরীরের শক্তিতে কেউ তাকে কাবু করতে পারত না। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। নিমেষে সেই দৈত্যকে ধরাশায়ী করে দিতেন; আর ছেলেদের তখন কী উল্লাস!

শচীবামনীর ক্রীড়াক্ষেত্র, বয়স্যদের উল্লাস, সব পেছনে পড়ে রইল। ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসছেন। জ্যৈষ্ঠমাস। গ্রীষ্মের গরম নিশ্বাস। প্রথম বার আসার সময়ে ঠাকুরদাস সঙ্গে এক জোয়ানকে নিয়েছিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যদি হাঁটতে না পারে তাহলে কোলে চাপবে। এবারেও জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে লোক নিতে হবে?'

ঈশ্বরচন্দ্র বীরের মতো বললেন, ' খুব পারব।'

জননী ভগবতীদেবীর মামার বাড়ি পাতুলে। প্রায় ছ' ক্রোশ। ঈশ্বরচন্দ্র মহানন্দে অক্লেশে সেই পথ অতিক্রম করলেন। সেদিনের মতো বিশ্রাম। পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা। তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে রাত্রিবাস হবে। অর্ধপথে একটি দোকানে ফলার হল। এরপর কয়েক পা হেঁটেই ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'বাবা, আমি আর হাঁটতে পারব না। এই দেখুন, আমার পা ফুলে গেছে।'

ঠাকুরদাস বললেন, সে আবার কী, কলকাতা এখনো অনেক দূর। না হাঁটলে কী করে হবে! কষ্ট করে একটু চল, তরমুজ খাওয়াব।'

ঈশ্বরচন্দ্র পা ফেলতে পারছেন না হাঁটবেন কী করে।

ঠাকুরদাস ভীষণ বিরক্ত হলেন। ছেলেকে খুব বকতে লাগলেন। ভয় দেখাবার জন্যে বলতে লাগলেন, 'তাহলে তুই এখানেই থাক আমি চললুম।'

কিছুদূরে চলেও গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনড়। ফিরে এলেন। ক্ষিপ্ত ঠাকুরদাস গোটা দুই থাবড়া মেরে বললেন, 'যদি চলতেই না পারবি তবে লোক নিতে দিলি না কেন?'

ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদছেন। পা ফুলে ঢোল। পিতার প্রহার। সময়ের পথে সময় অনেক দূর চলে এলেও, রামনগরের সেই পথ পথেই পড়ে আছে। দূরশতাব্দীতে ওই পথে দাঁড়িয়ে একজন বালক রোদন করছে রুদ্রমূর্তি পিতার তিরস্কারে। অনেকেই দেখেছিলেন চলার পথে। এই বালকই একদিন সর্বস্বপণ করে, বিধবাব চোখের জল মোছাবেন। প্রান্তরের এই বালক একদিন হবেন, বীরসিংহের সিংহশিশু। ১৮৯১ সালের ৩ আগস্ট 'ইন্ডিয়ান নেশন' এই সিংহ সম্পর্কে লিখবেন, He never wentout into the street without a few coins in his purse and never returned home without having distributed them.

ঠাকুরদাস ছেলেকে কাঁধে তুলে নিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কাঁধ থেকে নামিয়ে খুব অনুরোধ করলেন, 'বাবা, এইবার একটু হাঁট। ওই যে সামনে দোকান। তরমুজ কিনে দোবো।'

'কিন্তু তরমুজের প্রলোভনে পা ফুলা কমিল না। বরং পা দুখানি ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম পাইয়া আরও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িলেন।'

ঠাকুরদাস যথেষ্ট বলশালী ছিলেন না। সে এক মহা বিপর্যয়। কখনো কাঁধে, কখনো কোলে, মাঝে-মাঝে বিশ্রাম। এইভাবে অতি কষ্টে উত্তীর্ণ সন্ধ্যায়

রামনগরে বোনের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। পরের দিন সকালে কলকাতা যাত্রা। বৈদ্যবাটীতে এসে নৌকো ধরলেন। সোজা কলকাতা।

সংস্কৃত কলেজ

সবাই বললেন, ঈশ্বরের মতো মেধাবী বালককে ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করে দাও। পুত্রের ভবিষ্যতের অন্য রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠাকুরদাস। পূর্বপুরুষগণ সংস্কৃতে মহা মহা পণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাপনাই ছিল তাঁদের সম্মানজনক বৃত্তি। ঈশ্বরচন্দ্রও বংশের ধারায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হবে। বাড়িতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যা দান করবে।

স্বজনদের কোনো পরামর্শই তিনি গ্রহণ করলেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্যে ঈশ্বরই সুযোগ করে দিলেন। মায়ের মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। তাঁর পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন। পরে যিনি বিখ্যাত পণ্ডিত হবেন, মধুসূদনস্পতি, তিনি সেই সময় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করছেন। তাঁর উৎসাহ ও পরামর্শে, ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ১৮২৯ সাল, ১ জুন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স, ন'বছর।

তোপ

মহামান্য লর্ড আমহার্স্ট, গবর্নর জেনারেল বাহাদুর সমীপে,

যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ রাখাই উদ্দেশ্য হত, তা হলে স্কুলমেনদের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা না দিলেই হত। কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখত। সেইরকম এদেশের মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার রাখা যদি গবর্নমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছু নেই। এর পরিবর্তে এদেশীয়দের উন্নতিবিধান যখন গবর্নমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদাররীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যার দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে, গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া

যেতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কাজে ব্যয় করার অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেই অর্থে ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রতিভাশালী জ্ঞানী বক্তিকে নিযুক্ত করলে ও ইংরিজি শেখার জন্যে একটি কলেজ স্থাপন করলে ও সেইসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

রামমোহন রায়ের এই চিঠি সুবিখ্যাত বিশপ হিবার লর্ড আমহার্স্টের হাতে দিলেন। এই চিঠিটিকে নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যেতে পারে। রামমোহন রায় স্বদেশবাসীর মুখ যেন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দিলেন। নবীনের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে প্রাচীনের অবজ্ঞা তিনি করেননি। হিন্দুজাতির মহত্ব কোথায় তিনি তা বিশেষরূপে জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মঙ্গলজনক মিলন।

লর্ড আমহার্স্ট মিলন সাধন করলেন। পৃথিবীতে যত মহান পুরুষ জন্মেছেন ডেভিড হেয়ার তাঁদের একজন। কলকাতায় এলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। হয়ে গেলেন সমাজবন্ধু। তাঁর অবদানের শেষ নেই। তাঁরই দেওয়া জমিতে দুটি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। সংস্কৃত কলেজ আর হিন্দু কলেজ, সম্মিলিত। জমির পরিমাণ পাঁচ বিঘা সাত কাঠা।

১৮২৬ সালের, ১ মে। সংবাদ : গোলদিঘির উত্তরে ডেভিড হেয়ারের জমিতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে হিন্দু কলেজের যে বাড়ি সম্পন্ন হয়, ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি থেকে সেখানে উঠে যায় কলেজ। একই দিনে নতুন ভবনে উঠে এল সংস্কৃত কলেজ। এতদিন কলেজ চলছিল ৬৬ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে।

সাল ১৮২৯

কলকাতা টগবগ করে ফুটছে। সংস্কার আন্দোলনের শ্বাসে বাতাস গরম। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়েস মাত্র নয়। আন্দোলিত কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর অবস্থান। গরমের আঁচ তাঁরও গায়ে লাগছে।

এই বছর গড়ের মাঠে কলকাতার 'ল্যান্ডমার্ক' অক্টার লোনি মনুমেন্ট মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন বললে কেমন হয়, ইটের মনুমেন্ট স্বাগত জানাল মনুমেন্ট- সদৃশ ভবিষ্যতের মানুষটিকে। কলকাতার সায়েবরা গল্‌ফ খেলা

শুরু করলেন গল্‌ফ ক্লাবে। ভারতীয়দের এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হল। ২৮ জানুয়ারি বেলেঘাটায় 'টাওয়ার অব সাইলেনস'-এর উদ্বোধন হল। ১মার্চ, গৌরমোহন আঢ্য 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' স্থাপন করলেন মানিক বোসের ঘাটের কাছে বেঁশোহাটায়। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক পুরুষ বেরিয়ে আসবেন এই বিদ্যালয় থেকে। ৭মে প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক ইংরিজি সংবাদপত্র 'Bengal Herald'। রামমোহন রায় জড়িত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। ১০মে, প্রকাশিত হল, প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত'। চারটি ভাষায় এর প্রকাশ— বাংলা, ইংরিজি, পারসি, আরবি। সাধারণ সম্পাদক হলেন শল্য চিকিৎসক আর মন্টেগোমেরি। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার আর রাজা কিষেণ সিং—এর মালিক। ৬ জুন, ব্রাহ্মসমাজের জমি কেনা হল। ২৭ জুলাই, বাঙালি জীবনের এক সাংঘাতিক দিন। 'ইন্ডিয়া গেজেটে' সতীদাহ রদ আইনের আভাস প্রকাশিত হল। প্রাচীনদের দুর্গে নবীনদের প্রথম রামমোহন- গোলা। ১৭ আগস্ট স্থাপিত হল, প্রথম বাঙালি ব্যাঙ্ক—দ্বারকানাথের সাহসী উদ্যোগ, 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। এসে গেল নভেম্বর। ৮ তারিখে, লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ উচ্ছেদ বিষয়ে কাউন্সিলের সামনে পেশ করলেন তাঁর ঐতিহাসিক মিনিট। ৪ ডিসেম্বর বেন্টিঙ্ক কাউন্সিলে 'সতীদাহ রদ' আইনটি পাশ করলেন—১৮২৯-এর রেগুলেশন XVIII.

দুই বিরাট মাথা মুখোমুখি। রাজা রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশে হিন্দুদের প্রাচীন দুর্গের একটা পাশ ধসে গেল। ব্যাটা 'রামমোহন। সুরাই মেলের কুল/বেটার বাড়ি খানাকুল/বেটা সর্বনাশের মূল/ ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল/ও সে জেতের দফা, করলে রফা/মজালে তিন কুল।' স্কুলের বালকদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে এই গান। পথে-ঘাটে গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। সুর, তাল, বাদ্য-বাজনা সহযোগে পথ-ফেরি। প্রাচীন পন্থীদের ভাড়াটে গুণ্ডা রামমোহন রায়ের গাড়ি দেখলেই বেপরোয়া ইট পাটকেল ছুঁড়ছে। রাজা অকুতোভয়। কোচওয়ানকে বলছেন—কুছ পরোয়া নেহি, চালিয়ে যাও। সরকারি আদেশ। যে যাই করো, আর কিছু করার নেই।

Ragulation of 4th December. 1829

It is hereby declared that, after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the Sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall deemed guilty of culpable homicide and shall be-liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment.

ওদিকে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজা ঘোষণা করলেন, 'এই ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানবের ব্যবহারার্থে থাকিবে। সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। কোনও পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।'

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণি। আগে সংস্কৃত পড়েননি। প্রথম দিনেই প্রমাণ করলেন, তাঁর শ্রেণিতে তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট বালক। তৃতীয় শ্রেণির অধ্যাপনার দায়িত্বে ছিলেন, হালিশহরের কুমারহট্ট পল্লীনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। খুব নাম। অতি যত্নে, যথেষ্ট আগ্রহসহকারে, পুত্রবৎ স্নেহে ছেলেদের শিক্ষা দেন। ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায়, শেখার আগ্রহ দেখে বালকটিকে তিনি আরো কাছে টেনে নিলেন। ছ'মাস পরে যে পরীক্ষা হল সেই পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ টাকা বৃত্তি পেলেন।

সকাল

বড়ো বাজার থেকে পটলডাঙা। ১৮২৯ সালের ইংরেজ কলকাতা। শহর কলকাতা জাঁকিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে সুবর্ণবণিকরা কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলেন। এঁদের প্রধান বসতি গড়ে উঠল। বড়ো বাজার, ঠনঠনিয়া, বহুবাজার, পটলডাঙা, জোড়াসাঁকো ইত্যাদি অঞ্চলে। পণ্ডিত পরিবারের ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল বণিকাঞ্চলে।

১৭৫৭। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরদের জন্যে এক-একটি 'টোলা', 'টুলি' নির্দিষ্ট হল আদি অঞ্চল

'হাটখোলা' ঘিরে। কুমোরদের জন্যে 'কুমারটুলি'। ডোমটুলি, গোয়ালটুলি, নিহারিটুলি, নৈয়াটুলি, কসাইটোলা, জেলেটোলা, কলুটোলা, আহিরিটোলা, বেনিয়াটোলা, কম্বুলিয়াটোলা, কাপালীটোলা, ব্যাপারীটোলা, শাঁখারিটোলা।

'সুতানুটি হাটখোলা' কলকাতার 'নিউক্লিয়াস'। অতি প্রাচীন দুটি বাজার, সুতানুটি আর শোভাবাজার। ইংরেজরা সুতানুটিকে কেন বেছে নিলেন? One reason–Calcutta was situated near to several populous villages filled with cloth manufacturers. The sets and Bysaks who figure so largely in the early history of calcutta, belong to the weaver caste.

কুমারটুলির দক্ষিণে জোড়াবাগান। কলকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের আবাস। ঠাকুর, মল্লিক, ঘোষ। ঘন বসতিপূর্ণ। জোড়াবাগান ওয়ার্ডেই কলকাতার টাঁকশাল, স্ট্রান্ড রোড। এর পরেই আর একটু দক্ষিণে দুটি ওয়ার্ড—বড়ো বাজার আর ওয়াটারলু। এই দুটি ওয়ার্ডই তৎকালে সাহেবপাড়া ছিল। শ্যামবাজারের নাম ছিল চার্লস বাজার।

বল্লাল সেনের অসহ্য অত্যাচারে সুবর্ণবণিকরা সুবর্ণগ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলেন। একদল গেলেন বর্ধমানে। খড়গেশ্বরী নদীর তীরে কার্জনা নগরীতে। আর একটি শাখা গেলেন সপ্তগ্রামে। সরস্বতী গেল মজে। বণিকরা তখন গঙ্গাকে ভরসা করলেন। উভয় তীরে বসতি গড়লেন। অম্বিকাকালনা, বংশবাটী, হুগলি, বালী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙা, শ্রীরামপুর, নৈহাটি, হালিশহর।

ইংরেজরা কলকাতা জমিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে জড়ো হলেন, বড়বাজার, ঠনঠনিয়া, বহুবাজার, পটলডাঙা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি অঞ্চলে। এই কলকাতাই ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতা। রোজ সকালে নটার সময় পিতার হাত ধরে বড়োবাজারের বাসা থেকে বেরোতেন সংস্কৃত কলেজের উদ্দেশ্যে। বেলা চারটের সময় পিতার হাত ধরে বাড়ি ফেরা। কলেজের দুই অধ্যাপক, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ আর ছাত্র মধুসূদন, পরে যিনি সুখ্যাত বাচস্পতি হিসাবে পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। কর্তব্যপরায়ণ পিতা পুত্রকে হাতছাড়া করতেন না। কলকাতার জীবন দূষণ ঈশ্বরচন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারেনি।

পথে একাকী একটি ছাতা

[Men are but children of a larger growth-Dryden]

ঠাকুরদাস যখন বুঝলেন ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার উপযোগী হয়েছেন তখনই কলেজে একা যাওয়া-আসার স্বাধীনতা দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন। দেহের তুলনায় মাথাটি বৃহৎ। স্কুলে সহপাঠীরা বলত, 'যশুরে কৈ'। কখনো কখনো উল্টে বলত 'কসুরে জৈ'। ঈশ্বরচন্দ্র রেগে যেতেন। যত রাগতেন ছেলেদের উল্লাস তত বেড়ে যেত। ঈশ্বরচন্দ্র রেগে গেলে কথা আটকে যেত। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সূতিকাগৃহে নবজাতকের জিভের তলায় আলতা দিয়ে মন্ত্র লিখেছিলেন। বলেছিলেন, বালক অনেকদিন পর্যন্ত ভালোভাবে কথা বলতে পারবে না।

বড়ো বাজারের দিক থেকে একটি ছাতা এগিয়ে আসছে। তলায় ছোটো ছোটো দুটি পা। যেন ছাতার পা বেরিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র চলেছেন পটলডাঙার সংস্কৃত কলেজে।

পিতার ভূমিকা

ঠাকুরদাস জোড়াসাঁকোর রামসুন্দর মল্লিকের ব্যবসার সহকারী ছিলেন। মাসিক উপার্জন দশ টাকা। বড়বাজারের চকে মল্লিকমশাইয়ের দোকান। লোহা আর পেতলের তৈরি নানারকম বিলিতি জিনিসের কারবারি। যে-সব খদ্দের ধারে জিনিস কিনতেন তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনাই ছিল ঠাকুরদাসের বিরাট দায়িত্ব।

রোজ সকাল নটায় প্রবেশ, রাত নটায় নিষ্ক্রমণ। ফিরে এসে যদি দেখতেন প্রদীপ জ্বলছে আর সারাদিনের শ্রমক্লান্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন তাহলেই কুরুক্ষেত্র। শুরু হত প্রহার। সেই নির্দয় প্রহারে বিচলিত হয়ে মাঝে মধ্যে রাইমণিকে ছুটে আসতে হত পিতার হাত থেকে পুত্রকে উদ্ধার করার জন্য। কাতর রাইমণি ঠাকুরদাসকে এমন কথাও বলতেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা অন্য বাসা দেখে উঠে যান।'

পিতার প্রহারের ভয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রদীপের সরষের তেল চোখে ঘষে ঘুম তাড়াতেন। যন্ত্রণায় ছটফট। চোখ জবাফুল। কতটুকুই বা ঘুমোবার সময় পাওয়া যেত। ঠাকুরদাস শেষ রাতে ছেলেকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিতেন।

এই সময়টা মুখস্থের সময়। প্রথমে মুখস্থ করাতেন উদ্ভট কবিতা।

এই 'উদ্ভট' শব্দটি হেয়বাচক নয়। বহু প্রতিভাধর কবি ব্যাপক সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, দৃশ্যকাব্য, চম্পূকাব্য, স্তোত্রকাব্য প্রভৃতি রচনা করে খ্যাতিমান। এর পাশাপাশি আর এক ধরনের কাব্যের অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। অমূল্য, উজ্জ্বল সব হীরকখণ্ড। এসব হল 'সংস্কৃত কোষকাব্য'। কে কখন কোথায় বসে রচনা করেছেন, স্বাক্ষর রাখেননি। ভাব আর ভাষার মাধুর্যে লোকমুখে প্রচারিত। টুকরো টুকরো এইসব শ্লোক 'উদ্ভট' কবিতা নামে পরিচিত।

উদ্ভট কবিতার প্রশংসায় জনৈক কবি লিখছেন,

ভাষাসু মধুরা মুখ্যা দিব্যা গীধাণভারতী।
তত্র সুমধুরং কাব্যমুদ্ভটস্তু ততোদপি চ ॥

পৃথিবীতে যত ভাষা আছে তাদের মধ্যে মুখ্য ও স্বর্গীয় গুণযুক্ত ভাষা হল সংস্কৃত। সেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে মধুর হল কাব্য। আর সংস্কৃতে রচিত যত কাব্য আছে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর হল—উদ্ভট নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি।

শেষরাতে ঠাকুরদাস পুত্রের বিশুদ্ধ স্মৃতিতে সব ভরে দিতেন, যত তাঁর জ্ঞান আছে। এইসব শাণিত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হবে যোদ্ধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। ধুন্ধুমার লড়াই যখন শুরু হবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের পক্ষে। সে এক শিশুপালবধের মতো ব্যাপার,

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদি দাদাদো দুদদী দদো ঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দাদাদদ দদোদদ॥

একটা কাক অতিকষ্টে শয্যাত্যাগ করে 'কা' বলেছে। রাতের কালো কোথায় গেল। ঠাকুরদাস পুত্রকে মুখস্থ করাচ্ছেন লোকমুখে বিখ্যাত সেই শ্লোক,

তিমিরারিস্তমো হন্তি তেন শঙ্কিত মানসাঃ॥
বয়ং কাকা বয়ং কাকা রটন্তীতি প্রগেদ্বিকাঃ॥

অর্থ বলো। তিমিরারি মানে, অন্ধকারের শত্রু সূর্য অন্ধকার বিনাশ করে, তমো হন্তি। কাক ভয় পেয়েছে, শঙ্কিতমানসা ঃ। কেন শঙ্কিত! কাক যে কাল, সূর্য যদি তাদেরও বিনাশ করে! তাই তারা চিৎকার করে জানাচ্ছে, আমরা কাক, অন্ধকার নই। আমাদের বিনাশ কোরো না।

বলো, পূর্নোহপি কুম্ভো ন করোতি শব্দং /রিক্তো ঘটো ঘোষমুপৈতি ঘোরম্। জলপূর্ণ কলসি শব্দ করে না। শূন্য ছোট্ট একটি ঘট যদি গড়িয়ে যায়, শব্দে চমকে উঠতে হবে। দিন ভোর নয়, জীবনের ভোরবেলায় ঈশ্বরের স্মৃতিতে পিতা ঠাকুরদাস সঞ্চিত করে দিচ্ছেন সংস্কৃত সাহিত্যের যত মণি-রত্ন। ঈশ্বরচন্দ্র এইভাবে মুখেমুখে প্রায় তিনশো শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছিলেন। অপরদিকে শিক্ষক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ও বিভিন্ন বিষয়ের শ্লোক অন্বয় ও অর্থসহ মুখে মুখে শেখাতেন।

কেন হেরে যাব

ব্যাকরণ শ্রেণিতে তিন বছর। দুবছর পরীক্ষায় সর্বোত্তম ফল। তৃতীয় পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না। অথচ পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিলেন। বীতশ্রদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সংস্কৃত কলেজে আর পড়ব না। আমি দেশে গিয়ে সার্বভৌমের টোলে পড়ব।

ঈশ্বরচন্দ্রের জেদ। অনড় সিদ্ধান্ত। যা বলব তাই করব। অটল। কারো ক্ষমতা নেই যে টলায়। এই হল তাঁর চরিত্র। প্রত্যেকেই বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কোথায় সংস্কৃত কলেজ, আর কোথায় গ্রামের টোল। অবিচল ঈশ্বর। তখন তর্কবাগীশ মশাই আর বাচস্পতিমশাই বোঝাতে এলেন। ঈশ্বর। তোমার কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি পরীক্ষকের।

সেবার পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন এক সাহেব। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে পারতেন না। যা বলতেন ধীরে ধীরে। সাহেব পরীক্ষক এইটিকেই ত্রুটি হিসেবে ধরে নম্বর কম দিয়েছিলেন। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র সেবার প্রথম হতে পারলেন না। কিন্তু প্রথম যে তাঁকে হতেই হবে। স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না, কারো কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন। যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র আরো দুর্জয়। 'পরাজয়কে আমি ঘৃণা করি।' অসাধারণ যত্ন, অসাধারণ পরিশ্রম, সাফল্য আসতে বাধ্য। পরবর্তীকালে দেশবরেণ্য বিদ্যাসাগর যখন 'চরিতাবলী' লিখবেন, তখন লিখবেন, 'যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা- পড়া হয় না, অথবা যাহারা দুঃখে পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়, (তাহারা এই চরিতাবলী পড়।) হন্টর, সিমসন, হটন,

ওগিলবি, লীডন, জেঙ্কিন্স। লিখবেন 'বর্ণপরিচয়'—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মাটির প্রতিমায় চক্ষুতে চক্ষুদান করেন পুরোহিত মশাই। চিরআচার্য ঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্গপ্রতিমায় 'চক্ষুদান' এই 'বর্ণপরিচয়', যার অলিখিত অপর নাম 'বঙ্গ পরিচয়'।

প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালোবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালোবাসে না। তুমি কখনও লেখাপড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভালোবাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালোবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, তাহা আর অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন তাহা করিবে।

ঠাকুরদাসের কথাই শুনলেন। সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে বীরসিংহ গ্রামে সার্বভৌমের টোলে গেলেন না।

আমি একা

'আমার মতো গরীব অতি অল্পই হয়'। কখনো অন্ন জুটত, কখনো জুটত না। যখন জুটত, তখনো সকল সময় পেট ভরে খাওয়ার মতো হত না। যদি বা পেট ভরে জুটত তখন আবার ব্যঞ্জনের অভাবে শুধু নুনভাত। কোনোদিন যদি মাছ আর আনাজপত্র হঠাৎ এসে পড়ত, তখন মাছের ঝোল রাঁধতুম। সকাল-বেলা সেই ঝোলটুকু দিয়ে ভাত খাওয়া। রাতের বেলায়

ঝোলের আনাজ। মাছে হাত পড়ল না। পরের দিন সকালে মাছের অম্বল সহযোগে ভাত। এক ঝোলে তিন কিস্তি।

পরিবেশ, পরিস্থিতির কাছে হেরে যেতে রাজি নই আমি। নদী আমার উপমা। যেখানে বাধা, যখনই বাধা, তখনই স্রোত আরো প্রবল। পিতা একদিন কাকভোরের পাঠের আসরে আমাকে এই শ্লোকটি শিখিয়েছিলেন। আমার জীবন বেদ,

লভন্তে ন বিনোদ্যোগং প্রানিনঃ সম্পদাংপদম্।
অব্ধিমন্থনজং দুঃখং লব্ধা দেবাঃ সুধাং পপুঃ॥

উদ্যোগ ছাড়া প্রাণীরা সম্পদের পাত্র হতে পারে না। যেমন দেবতারা উদ্যোগী হয়ে সমুদ্রমন্থন করেছিলেন বলেই, সেই মন্থনের সময় উৎপন্ন দুঃখ ভোগ করে, পরে তাঁরা ওই সমুদ্র থেকে উত্থিত অমৃত পান করে অমর হয়েছিলেন।

দিনের দিন-লিপি

প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান। আসার পথে কাশীনাথবাবুর বাজারে বাজার করা। বাসায় ফিরে বাটনা বাটা, মাছ, তরিতরকারি কাটা, ধোওয়া। উনুন ধরান। রান্না। চার-পাঁচজনের রান্না একা এক হাতে। কাটা, বাটা, ধোয়া। দেশ থেকে আমার মেজভাই দীনবন্ধুকে কলকাতায় এনে বাবা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। স্নান করে এসেই প্রাতঃসন্ধ্যা। এই কাজটিতে অবহেলা হলেই পিতার প্রহার।

সকলের আহারাদি হয়ে যাওয়ার পর আহারের স্থান নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা। বাসনপত্র সঙ্গে সঙ্গে মেজে, ঘষে, ধুয়ে, মুছে যথাস্থানে সুষ্ঠুভাবে রাখা। পিতার কড়া নির্দেশ। আরো কড়া নির্দেশ, পাতের পাশে একটি ভাতও যেন পড়ে না থাকে। অন্যথায়, প্রচণ্ড প্রহার। এইসব শেষ করে ঠিক নটায় কলেজের জন্যে বেরিয়ে পড়া।

কোনো কষ্ট, কোনো বিরক্তি? না। আনন্দ। কষ্ট করার, লড়াই করার আনন্দ। এই পথ, এই দুঃখকষ্টের পথ ধরেই যে রামপ্রসাদ হেঁটে গেছেন দুপাশে দুঃখনামক পরম সুখের গান ছড়াতে ছড়াতে

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভেবে দেও দুঃখ মা, আর কত চাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনোখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।

'এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উত্তরকালে নির্ভয়ে ও শান্তচিত্তে সকল বিপদভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কেহ কখনো তাঁহাকে বিপদে বা রোগে অসহিষ্ণু হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া বোধহয় না।'

বিদ্যাসাগরমশাই পরবর্তীকালে 'কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নের আয়োজন করিতেন, নিজে নিকটে বসিয়া নিমন্ত্রিতগণকে আহার করাইতেন, কেহ কিছু ফেলিয়া রাখিলে, তাঁহার পিতৃদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিলে আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতেন, আর তুমি এত জিনিস নষ্ট করিবে? তা কখনো হবে না, ওগুলি সমস্ত খাইতে হইবে।'

নরকের নাম কলকাতা

সে এক কলকাতা। চারদিকে পুকুর আর ডোবা। থকথকে ময়লা, কালো জল। পচা দুর্গন্ধ। এক-একটি নরককুণ্ড। রাজপথের দুপাশে ভটভটে নর্দমা। খাটা পায়খানা। 'শতকরা নিরানব্বইখানি গৃহস্থবাড়িতে মলমূত্র ও কৃমিপূর্ণ পূতিগন্ধময় এক-একটা নরককুণ্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল।' 'রেতে মশা দিনে মাছি/ এই তাড়্যে কোলকেতায় আছি।'

ঠাকুরদাস ছেলে দুটিকে নিয়ে বড়ো বাজারের যে-বাড়ির একতলায় থাকতেন সেখানেও এইরকম নরককুণ্ডের অভাব ছিল না। পায়খানা, পাতকুয়া, তার চারপাশ একটি নরক। যে ছোট্ট ঘরখানিতে ঈশ্বরচন্দ্র রান্না করতেন, সেই ঘরখানির অদূরেই এই নরক। সূর্যের আলো ঢোকার উপায় ছিল না। দিনের বেলাতেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রদীপের আলোতে যতটুকু দেখা যায়। প্রচুর আরশোলার লীলাক্ষেত্র।

একটি আরশোলা

একদিন সকলে আহারে বসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর তরকারির মধ্যে একটি বড়ো মাপের আরশোলা আবিষ্কার করলেন। সেটিও রান্না হয়ে গেছে। তুলে পাতের পাশে ফেলে দিলে ঘেন্নায় সকলের খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরচন্দ্র অম্লানবদনে আরশোলাটি কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন।

এ এক অলৌকিক আত্মশাসন। পাকশালার পাশেই নরককুণ্ড। ঈশ্বরচন্দ্র একঘটি জল নিয়ে আহারে বসতেন। 'কৃমিসকল দলে দলে আমার ভোজনপাত্র আক্রমণ করিতে আসিত। তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য ঘটি হইতে জল ঢালিয়া দিতাম, আর তাহারা সেই প্রক্ষিপ্ত জলস্রোতের সহিত দূরে পড়িত। দুর্গন্ধের তো কথাই ছিল না।'

নেপোলিয়ান

'যে ন্যক্কারজনক গরলকণা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে লোক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরিমল-পয়োধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে ভোজন-পাত্র শূন্য করিতেন। এইরূপ বিবিধ শত্রু-সমাকুল স্থানে নেপোলিয়নের ন্যায় নিশ্চিত চিত্তে উপবেশন পূর্বক রন্ধনাদি কার্য সমাপন করিয়া অপর সকলকে আহার করাইয়া, পরিশেষে নিজের জঠরানল নির্বাণ করিতেন।

নেপোলিয়ানের চরিত্র তাঁকে আকর্ষণ করত। তাঁর নীতিবোধ গ্রন্থে তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথা লিখেছেন—'অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষদশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে।'

উঠে দাঁড়াতে হবে। সামান্য অবস্থা থেকে উঠতে হবে। নিজের ক্ষমতায়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়েস এগারো। ব্যাকরণ শ্রেণির পাঠ শেষ করে সাহিত্য শ্রেণিতে প্রবেশ করলেন। এই সময়ে তাঁর উপনয়ন সংস্কার হল। পৈতাধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সাহিত্যের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংশয় প্রকাশ করলেন, 'এত অল্প বয়সের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্যের কী বুঝবে?'

অভিমানী ঈশ্বরচন্দ্র আহত হলেন, 'আমাকে পরীক্ষা করা হোক, যদি অযোগ্য হই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাব।'

পরীক্ষা

'বেশ তাই হোক। দেখি তোমার কত ক্ষমতা।' তর্কালঙ্কার মহাশয় ভক্তিকাব্যের কয়েকটি কঠিনতম কবিতার অর্থ জানতে চাইলেন। এগারো বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র অন্বয়সহ অর্থ করলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্তম্ভিত। এমন ব্যাখ্যা কোনো বয়স্ক পণ্ডিতের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'না, ঈশ্বর, আমার ভুল হয়েছিল। তোমাকে আমি সাহিত্য পড়াব, প্রাণ ঢেলে পড়াব'

তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে ঈশ্বরচন্দ্রের ক্রম প্রবেশ। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয়, মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী,মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমার- চরিত।

শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে সকলকে চমৎকৃত করলেন।

ধরা পড়ে গেলেন

ঘর-সংসারের কাজ। প্রবল পড়ার চাপ। এর ওপর ত্রিসন্ধ্যা। সন্ধ্যাহ্নিক-এর মন্ত্র ভুলে বসে আছেন। সন্ধ্যায় না বসলে পিতার প্রহার। সে-প্রহারের যাঁরা সাক্ষী তাঁরা শিউরে উঠতেন। সিংহ পরিবারের রাইমনি, স্নেহশীলা। তিনি সবার আগে ছুটে এসে একটি কথাই বলতেন, 'মার খেতে খেতে এরা একদিন মরবেই মরবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মহত্যা করে আমাদের আর পাপের ভাগী করবেন না ঠাকুরমশাই।'

ঈশ্বরচন্দ্র যথারীতি সন্ধ্যা করতে বসতেন। মন্ত্রছাড়াই ক্রমগুলি এমনভাবে করতেন, দেখলে মনে হতে তিনি সন্ধ্যা করছেন। আসলে ফাঁকা সন্ধ্যা। একালের ভাষায় চিটিং। একদিন খুল্লতাত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ হল। ভাইপো ঈশ্বর মনে হচ্ছে চালাকি করছে। 'এই শোন, আমার সামনে

বসে সন্ধ্যাহ্নিকের সব মন্ত্র আবৃত্তি কর।'

ধরা পড়ে গেলেন ঈশ্বর। পিতার নিগ্রহ। আগে মন্ত্র মুখস্থ তারপর আহার। সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্র অনেক। এক বছরেও মুখস্থ হয় না অনেকের। কিছুক্ষণ পরেই ঈশ্বর বললেন, 'হয়ে গেছে।'

'বলো।'

আদ্যোপান্ত গড়গড় করে বলে গেলেন, নির্ভুল।

কোনো সন্দেহ নেই, এ-ছেলের আশ্চর্য মেধা, আশ্চর্য স্মরণশক্তি।

ঠাকুরদাসের স্বপ্ন

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের পাঠ শেষ করবে। বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে টোল খুলবে। দরিদ্র, নিরাশ্রয় বালকরা পড়তে আসবে। 'ঈশ্বর তোমার বৃত্তির টাকায় দেশে কিছু জমি কেনো। সেই আয়ে বিদেশ থেকে তোমার টোলে যে-সব ছাত্র আসবে তাদের ভরণ-পোষণ হয়ে যাবে।'

বৃত্তির টাকায় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি কেনা হল।

কিছুকাল পরে ঠাকুরদাস বললেন, এইবার কিন্তু ভালো বই কেনো। বৃত্তির টাকায় ঈশ্বরচন্দ্র ভালো ভালো কিছু পুঁথি কিনলেন। টোল না হোক পুঁথিগুলি তাঁর গ্রন্থাগারে সারাজীবন সংরক্ষিত ছিল। পিতা ও পুত্র দুজনেরই স্বপ্ন বীরসিংহে অনাথ বালকদের জন্যে বিরাট একটা টোল হবে।

ছুটিতে বীরসিংহে যেতেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর সাফল্যের বার্তা গ্রামে এসে গেছে। সেকালের শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণ সংস্কৃত শ্লোকে লেখা হত। সে-সব ঈশ্বরই রচনা করতেন যখন গ্রামে থাকতেন। একবার এক ধনী মানুষ আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়ে শ্লোক লিখিয়ে নিলেন। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই শ্লোকের রচনা-পারিপাট্য, শব্দবিন্যাস আর পদলালিত্যে মুগ্ধ হলেন। 'আমরা রচয়িতাকে একবার দেখতে চাই।'

কর্মকর্তা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন।

বিস্ময়! এই অল্পবয়সে এমন অদ্ভুত রচনা! 'তুমি বসো। খানিক ব্যাকরণের বিচার হোক।'

ঈশ্বরচন্দ্র বসলেন। অনর্গল সংস্কৃত ব্যাকরণের বিচার। পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তব্ধ! এ যা হল পাকা পণ্ডিতও হয়তো পারবেন না। তোমাকে

আশীর্বাদ করি, তুমি খুব বড়ো হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।'

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। আর কিছুদিনের মধ্যে এদেশে তাঁর আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। বাংলাভাষার মতোই অনর্গল সংস্কৃত বলতে পারেন। দেবভাষাই যেন তাঁর মাতৃভাষা। বালকের প্রতিভায় পণ্ডিতমণ্ডলী নির্বাক।

আধপয়সার ছোলা আধপয়সার বাতাসা

প্রতিভার বিকাশ আহার নির্ভর নয়, শ্রম ও সংস্কার নির্ভর। নিজের জীবনে প্রমাণ করলেন। বিকেলে সকলের জলখাবার আধপয়সার ভেজানো ছোলা আর আধপয়সার বাতাসা। কোনো অভিযোগ নেই, বিরক্তি নেই, বিদ্রোহ নেই। সদা প্রসন্ন, সদা হাস্যমুখ। নিজের দুঃখে জল আসে না চোখে অন্যের দুঃখে কেঁদে ভাসান।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি। তখন আর পণ্ডিত ঈশ্বর নন, চির বালক। নিজের ভাইদের আর গ্রামের বালকদের নিয়ে মাঠে খেলা। খেলার ফাঁকে ফাঁকেই হৃদয়ের কাজ করে চলেছেন। অমুকের হাঁড়ি চড়ছে না, অমুকের অসুখ, বৃত্তির টাকা থেকে যথাসাধ্য করে আসছেন। 'এ কী, কাকা আপনার কাপড়ের এ কী দশা! দাঁড়ান, দাঁড়ান!' গামছা পরে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি দিয়ে দিলেন।

আখ্যানমঞ্জরী

'ইংলন্ডের অন্তঃপাতী ফ্রোম নগরে রো নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্মিণী সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। এই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন। অন্যের দুঃখ দেখিলে, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখবিমোচনে যত্ন করিতেন। তাঁহার যে নিরূপিত আয় ছিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী অংশ ব্যতিরিক্ত, তৎসমুদয়ই দীনগণের দারিদ্র্য-দুঃখ নিবারণে নিয়োজিত হইত।'

'বিবি রো কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকবিক্রেতাদিগের

নিকট হইতে প্রথমবার যে টাকা পাইলেন, এক দীন পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, সমুদয় তাহাদিগকে দান করিলেন। একদা, আর একটি নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হয়, এরূপ অর্থ তৎকালে তাঁহার হস্তে ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে বাসন বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাদের আনুকূল্য করিলেন।'

'তিনি কেবল ধন দ্বারা সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; অবসরকালে গৃহে বসিয়া স্বহস্তে নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, এবং যখন যাহাদের যেরূপ পরিচ্ছদের অপ্রতুল দেখিতেন, তাহাদিগকে সেইরূপ দিতেন। তিনি অন্যের বিপদে বিপদজ্ঞান করিতেন; অন্যের শোকে শোকাকুল হইতেন। পীড়িত বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন।'

'পথিমধ্যে যদি তিনি অপরিচিত বালক দেখিতে পাইতেন; আর যদি, তাহার আকার দেখিলে সুবোধ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। যদি জানিতে পারিতেন, পিতা-মাতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, অবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ের নির্বাহ করিতেন। এইরূপ তিনি অনেক দীন বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, কখনও কখনও স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি কোনও বালককে তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে দেখিতেন, আমার যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইল ভাবিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেন, তাহার বিপরীত দেখিলে, তাঁহার শোক ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না।'

বিবি রো-র দয়ার কথা, সমুদ্রের মতো হৃদয়ের কথা লিখছেন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর, 'আখ্যানমঞ্জরীতে', তিনি নিজে কি? 'পিতা দরিদ্র, নিজে সর্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অন্য সহাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন।' কারো অসুখ করেছে শোনামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিজের পরিধানে বাড়ির চরকা-কাটা সুতোয় বোনা মোটা চটের মতো কাপড় আর নিজের টাকায় অন্য অভাবী ছেলেদের অপেক্ষাকৃত ভালো পাতলা কাপড় কিনে দিচ্ছেন।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর তর্পণ করছেন এই ভাবে-ঈশ্বরচন্দ্র

সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন দুঃখের সঙ্গে, দুঃখের কারণের সঙ্গে নয়। তোমার দুঃখ? আমি আছি তোমার পাশে। কেন তুমি দুঃখী সে-বিচার যে করবে, সে করবে। এসো আপাতত তোমাকে উদ্ধার করি।'

'অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়; বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'

মন্ত্র বেরবে দক্ষিণেশ্বর থেকে

বীরসিংহ; কামারপুকুর সবই জাহানাবাদের এপাশে ওপাশে। নবাবী পথের ধারে। কোনোরকমে বেঁচে থাকার সংগ্রামক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, তর্কবাগীশ, তর্কালঙ্কারদের ধার ধারতেন না। বিদ্যাসাগরের 'গোঁ'। শ্রীরামকৃষ্ণেরও 'গোঁ'। দুজনেই গোঁ গোঁ করে কলকাতায় এলেন। বিদ্যাসাগর আশ্রয় নিলেন বড়ো বাজারের সিংহী বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে ঝামাপুকুরে দাদার টোলে। তারপর দক্ষিণেশ্বরের ডামাডোলে। মাহিষ্য রানি রাসমণি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গঙ্গার তীরে উদ্যান সমন্বিত বিশাল কালীমন্দির করলেন। বাঙলার ব্রাহ্মণরা প্রতিষ্ঠা করতে দেবেন না। যিনি জগতের মা, শ্মশান যাঁর বিচরণক্ষেত্র, তিনি মাহিষ্যের অন্ন গ্রহণ করতে পারেন না। অসম্ভব! মা কালীর জাত যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টুলো পণ্ডিত রামকুমার ব্রাহ্মণদের সংস্কারের দেয়ালে পেরেক ঠুকলেন, ১৮৫৫ সাল। ৩১ মে। মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। ঘর্মাক্ত মা বেরিয়ে এলেন প্যাকিং বাক্স থেকে। দাঁড়ালেন রৌপ্যনির্মিত পদ্ম সিংহাসনে। দানের ঘটা। মুদ্রা ও মিষ্টান্নের পাহাড়। সারা ভারতের বাঘা বাঘা স্মার্ত পণ্ডিতরা এলেন। রাতের বেলা গঙ্গার পূর্বকূলে আলোর রজতগিরি। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রা। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐস্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রানি অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারানসী,

শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া এদিন প্রত্যেকে রেশমীবস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায় স্বরূপে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠাশ উপলক্ষে রানি নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।'

সুযোগ্য পূজারীর অভাবে পণ্ডিত রামকুমার আজীবন পূজার দায়িত্ব নিলেন। ব্রাহ্মণসমাজে এ এক প্রথা ভাঙার বিপ্লব। এই ঘটনার ষোলো বছর পেছনে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তরুণ অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্র যখন অধ্যাপক বিদ্যাসাগর, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় তখন ছ'বছরের বালক।

গদাধর চট্টোপাধ্যায় যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুত্থান ভূমিতে প্রবেশ করছেন তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর মূর্তির বয়স ছত্রিশ বছর। এই ছত্রিশটি বছরের প্রতিটি মুহূর্তসংগ্রামের, আন্দোলনের, সংঘাতের, জাগরণের। নির্ভীক নিরাসক্ত এক পুরুষ সিংহ।

যুগসন্ধি

১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করলেন। পাশেই একই বাড়িতে হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ তখন ডিরোজিওর প্রভাবে কম্পিত। সে প্রভাব সারা কলকাতায় ছড়িয়েছে। ডিরোজিও একটি ঝড়ের নাম। হিন্দুসংস্কারের বটবৃক্ষের ডালসমূহ মটমট করে ভাঙছে। যেন, 'ওই নূতনের কেতন ওড়ে'। যুবসমাজের জয়ধ্বনি। 'ড্রুজু হাঙ্গাম'। শহর তোলপাড়। বিস্মিত ক্ষুব্ধ, ত্রস্ত, ক্ষিপ্ত প্রাচীন সমাজ।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র আর হিন্দু কলেজে, রামতনু লাহিড়ী, দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সকলেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত। 'ডিরোজিয়ান' নামে পরিচিত। এঁরা সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়।

ডিরোজিওর প্রভাবে এই জাগ্রত, নব্য বাঙালি যুবকরা যে বাড়াবাড়ি শুরু করলেন, তা এক ধরনের ফিরিঙ্গি অসভ্যতা। পাদরিদের উস্কানি। হিন্দুরা

হিদেন। মূর্তি পূজা করে। স্বামী মারা গেলে মেয়েদের বিধবা করে। স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। গঙ্গার জলে জীবন্ত নবজাতককে মা নিজের হাতে ভাসিয়ে দেয়। এক ধরনের বীভৎস জন্তুর নাম হিন্দু। মানুষ যদি হতে চাও, চলে এসো আমাদের গির্জায়। খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন কর। শেরি, শ্যাম্পেন, হুইস্কি রাম। সকালে উঠিয়া তুমি জোরে জোরে বল,

হেয়ার কল্বিন পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরা : স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।।

হিন্দুগুলোকে ধর আর খ্রিস্টান করে দাও।

সাহেবদের সন্তুষ্টির জন্যে কীর্তনিয়া গান ধরলেন,

শ্যাম going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your okroon uncle is a great rascal.

বাজারে, পথে, ঘাটে, রাস্তার মোড়ে, স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে আলখাল্লা পরা পাদরিরা হিন্দুধর্মকে গালাগাল দিতেন আর প্যামফ্লেট বিলি করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এপাশে ভট্টিকাব্য, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ পড়ছেন, জলের মতো সংস্কৃত বলছেন, আর ওদিকে তাঁর হিন্দু কলেজের বন্ধুরা পড়ছেন,

গোল্ডস্মিথের ইতিহাস—গ্রিস, রোম, আর ইংলণ্ডের
রাসেলের আধুনিক ইওরোপ
রবার্টসনের পঞ্চম চার্লস
গে-র উপকথা
পোপের অনুবাদে হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি।
ড্রাইডেনের ভার্জিল
মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট
শেকসপিয়রের একটি ট্রাজেডি।

গোরু খেতে পারিস! গোরু খেতে পারিস!

'ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞান লোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধত- বেশে দোকানদারের নিকট গিয়া বলিতেন, গোরু খেতে পারিস?

গোরু খেতে পারিস? এঁদের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও। তিনি অবশ্যই এই অতি বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মকাল ও জীবনকালে তিনি আলোকিত, সংস্কারমুক্ত একটি সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন রাজা রামমোহন। এই বাড়াবাড়ি ক্রোধের অভিব্যক্তি। স্মার্তদের শাস্ত্র বাঙালি জীবনে ধর্ম নয় নিপীড়ন। নারী নিগ্রহের আখমাড়াই কল বিশেষ।

ঈশ্বরচন্দ্র পোশাকে, পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে খাঁটি ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যাহ্নিক করেন; কিন্তু তাঁর কোনো কুসংস্কার নেই। ঈশ্বরচিন্তার চেয়ে মানবচিন্তাই বেশি করেন। ডিরোজিয়ানদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা তৈরি হয়েছিল।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মাথা দিয়ে লড়াই করছিলেন, যেন গুঁতোচ্ছিলেন। প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত। সৎসাহস প্রকাশের সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল মুসলমানের দোকানের রুটি আর মাংস খাওয়া। একদিন তাঁরা ঠিক করলেন মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। জল্পনা-কল্পনায় দিন তিনেক গেল। সাহসের অভাব হচ্ছে। শেষে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে তাঁরা এক মুসলমানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবনা চলছে, ঢুকব কী ঢুকব না। শেষে অসীম সাহসী একজন ঢুকে পড়লেন। তাঁর পা কিন্তু কাঁপছে। শেষে বিস্কুট কিনে যখন বেরিয়ে এলেন, সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, Hip! Hip! Hurrah! সেই গগনভেদী চিৎকারে সকলে চমকে উঠলেন। দোকানের মালিক অবাক, হলটা কী? হিন্দু কুসংস্কারের দেয়ালের ইট খোলা হল। হিন্দুসমাজপতি রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দিকে একটা গোলা ছোঁড়া হল। গ্রে স্ট্রিট কেঁপে উঠল।

হিন্দুধর্মের মূল দর্শন তুলনাহীন। এক মহাবিজ্ঞান। অনন্তে অস্তিত্বের অনুসন্ধান। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। পুরোহিতদের হাতে পড়ে উচ্চতানের সেই মহান ধর্মের কী অবস্থা! একদিকে নরক একদিকে স্বর্গ। মাঝখানে মানুষ নয় কিলবিল করছে রাশি রাশি পাপী। একাদশীর দিন পুঁইশাক খেয়ে মরেছ? নরকে গমন অবধারিত। পুরোহিতমশাই বাঁচান। টাকা ছাড়ো, দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং। নাও গোবর খাও, মাথাটা মুড়িয়ে ফেলো।

যেখানে ধর্মব্যবসায়ী সেইখানেই গোলযোগ। পাদরিদের হাতে পড়ে খ্রিস্টধর্মের কি অবস্থা! রাজা রামমোহনের একদিকে শাক্ত আর একদিকে

বৈষ্ণব। মাতামহ শাক্ত, তান্ত্রিক, বাকসিদ্ধ। যাকে যা বলেন তাই ফলে যায়। পিতামহ ভক্তিমার্গী বৈষ্ণব। শৈশবে রামমোহন মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। মাতামহ পূজার পর শিশু রামমোহনকে একটি বেলপাতা দিয়ে বলেছেন, চিবিয়ে খেয়ে ফেল। বালক রামমোহনের মুখে বেলপাতা দেখে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা ফুলঠাকুরানী, রামমোহনের মাতা ভীষণ রুষ্ট হলেন। মুখে আঙুল পুরে চর্বিত বিল্বপত্র ফেলে দিয়ে ছেলেকে জল দিয়ে বললেন, ভালো করে কুলকুচো কর। পিতাকে সমানে তিরস্কার করে চলেছেন, জানো না, আমরা বৈষ্ণব। তিরস্কৃত পিতা রেগে গিয়ে বললেন, 'ফুলু, তোর এত অহংকার, পুজোর বেলপাতা ফেলে দিলি। যা তোর ছেলে বিধর্মী হবে।'

ফুল ঠাকুরানী পিতার পা জড়িয়ে ধরলেন, 'পুজোর আসনে বসে এ কি করলে তুমি? তোমার কথা যে ফলবেই ফলবে।'

শ্যাম ভট্টচার্য্যমশাই কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বললেন,

'আমার কথা অব্যর্থ; তবে তোর পুত্র রাজপুজ্য অসাধারণ এক ব্যক্তি হবে'।

রামমোহন আত্মপ্রকাশ করলেন বেদ নিয়ে। গুচ্ছের দেবতা, গুচ্ছের ধর্মমত অবান্তর কলহের অনন্ত উৎস। তিনি এলেন 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্রের উদ্গাতা হয়ে আধুনিক এক শঙ্করাচার্য। ওঁ তৎসৎ—সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য'—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য। পরমেশ্বরই সত্য, সর্ব জীবের নিয়ন্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীবজগৎ সব তাঁর।

ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।
যে রচিল সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদমে দেবং ভুবনেশমীড্যং।।

তিব্বত থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলেন। বৌদ্ধ লামারা তাঁর একত্ববাদে ক্ষিপ্ত হয়ে খুন করতে চেয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচালেন করুণাময়ী এক তিব্বতি রমণী। রামমোহন রমণীদের ঋণশোধ করলেন 'সতীদাহ' প্রথা রদ করিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এলেন ১৮২৯ সালে। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন

১ জুন। রামমোহন কলকাতায় এলেন ষোলো বছর আগে ১৮১৪ সালে। বঙ্গভূমি অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাজধানী কলকাতায় সাহেবরা তখনও কিঞ্চিৎ নড়বড়ে। বঙ্গসমাজের অবস্থা, পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর। বেদের কর্মকাণ্ড, ঔপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের কোনো কদর নেই। দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল। পরিত্রাণের উপায়, গঙ্গাস্থান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, উপবাস। আর জাতের বড়াই। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র। 'ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সকালে গঙ্গাস্থান করে ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন কোশাকুশি হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করতেন। সেকালে সংবাদপত্রের অভাব এঁরাই পূরণ করতেন। দেশ-বিদেশের ভালমন্দ খবর পরিবেশন। পরচর্চা, পরনিন্দা। কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসবে কে কত ঘটা করলেন। এসব শোনানোর অর্থ, তুমিও যোগ্য হওয়ার চেষ্টা কর। বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলেও আমি শিখা-সূত্রধারী ব্রাহ্মণ, অতএব দানের পরিমাণ বাড়াও। শূদ্র ধনীদের ওপর এইসব ব্রাহ্মণদের প্রবল আধিপত্য। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন।'

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বেদ-বেদান্তের ধার ধারতেন না। তাঁদের পাণ্ডিত্য ন্যায় আর স্মৃতিশাস্ত্রে। সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করতেন অর্থ না জেনে। বিষয়ী ধনীদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। শুদ্ধ বাংলা লেখার ক্ষমতা ছিল না। বিষয়কর্মের উপযোগী চিঠি লেখা আর অঙ্ক জানা থাকলেই লক্ষ্মীলাভ। যাঁর সামান্য ইংরিজি জানা থাকত তাঁর ভীষণ অহঙ্কার। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে একজন ইংরিজি পড়াতেন। তিনি পড়াতে আসতেন জরির জুতো আর মতির মালা পরে। প্রথম প্রথম ইংরিজি শেখার পাঠ্যপুস্তক ছিল টামস ডিসের স্পেলিংবুক, স্কুল মাস্টার, কামরূপা আর তুতিনামা। 'স্কুল মাস্টার' পুস্তিকায় ছিল গ্রামার, স্পেলিং আর রিডার। কামরূপাতে ছিল এক রাজপুত্রের গল্প। তুতিনামা একটি পারসি বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ। যাঁর ইংরিজি বিদ্যা একটু বেশি, তিনি পড়তেন অ্যারেবিয়ান নাইট। যিনি রয়েল গ্রামার পড়তেন তিনি তো বিরাট পণ্ডিত। লোকে বলত 'রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ'। ময়াল সাপ আকার আকৃতিতে বিশাল। তেমনি রয়েল গ্রামার যিনি পড়েছেন তিনিও বিশাল। সেই সময় বানান নিয়ে খুব বড়াই ছিল। কার কত জ্ঞান! বিবাহসভায় বানানের লড়াই। একজন জিজ্ঞেস করলেন, you spell

Nebuchadnezzar ? কেউ জিজ্ঞেস করলেন, How ıo you spell xerxes? আরও দুটো বানান ছিল Xenophen, Kamsc ıatka, তোমার নাম কি জিজ্ঞেস করতেন না, বলতেন What enomination put your papa?

রাজা রামমোহন, বঙ্গবন্ধু ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ স্থাপন করে প্রকৃত ইংরিজি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। 'ডিরোজিও হাঙ্গামা' আর কিছুই নয়, 'টিথিং ট্রাবল।' অতঃপর কি করা দরকার? বাঁদরামিটা কি? নিজের অতীত, নিজের উত্তরাধিকার ভুলে 'ব্রাউন সাহেব' হয়ে একুল ওকুলদু-কুল না হারান। প্রকৃত ধর্ম মানুষের একটা বড়ো আশ্রয়স্থল। মেরুদণ্ড। বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বগ্রাহ্য একটা ধর্ম হিন্দুদের বেদ আর উপনিষদ থেকেই বেরোতে পারে, জীবনধর্মী ধর্ম।

রাজা! বলুন কে আমার উপাস্য?

শোনো, অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত
অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ,
ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা ও অতিশয় আশ্চর্যান্বিত
রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদিযুক্ত
যে এই জগৎ, এবং নানাবিধ স্থাবরজঙ্গমশরীর যাহার
কোনো এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর
ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ
ও নির্বাহকর্তা যিনি, তিনিই উপাস্য।

কোশাকুশি, গঙ্গাজল, পাদোদক, হবিষ্যান্ন, উপবাস—এ সবের প্রয়োজন নেই! বৃহতের চিন্তায়, অনন্তের চিন্তায় নিজের পরিসর বাড়াব। রাজা সেই সর্বনাশ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যার নাম হবে মধুসূদন ট্রাজেডি। প্রতিভাবান এক যুবক সাহেব হতে গিয়ে অকালে ঝরে গেলেন। এসেছিলেন ১৮২৪ সালে, ঈশ্বরচন্দ্রের আগমনের চার বছর পরে।

১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের সর্ব নিম্ন শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। মধুসূদনের বয়েস তখন, ন বছর। ঈশ্বরচন্দ্রও ন বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেছিলেন। ১৮৩৩ সালে মধুসূদন যখন ভর্তি হলেন, তখন হিন্দু কলেজের পূর্ণ যৌবনাবস্থা। বাঙলাদেশে যত বিদ্যালয় ছিল, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে। ছাত্র আর শিক্ষকগণের গৌরবে এই প্রতিষ্ঠা। ১৮৩১ সালে কলেজ কমিটি বিতর্কিত শিক্ষক ডিরোজিওকে কলেজ থেকে

বহিষ্কার করেছেন। বিতাড়নকারী দলের পান্ডা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পিতা রামকমল সেন। ওই বছরই বড়োদিনের পরের দিন ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিও মারা গেলেন। বয়স মাত্র বাইশ বছর আট মাস আট দিন। কলকাতায় তখন একটিই মারণব্যধি পাড়ায় পাড়ায় মানুষ শিকার করে বেড়ায়, অসুখটির নাম, ওলাওঠা, কলেরা।

মধুসূদন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করে ডিরোজিওর অদৃশ্য উপস্থিতি টের পেলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। সেই সময় হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা করছেন বিখ্যাত সব শিক্ষক—ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ রিজ, হালফোর্ড এবং ক্লিন্ট। স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক জোন্স। নীচের ক্লাসের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র, রামতনু লাহিড়ী।

রাজা রামমোহন ইংরিজি শিক্ষার জন্যে এই রকম উচ্চমানের এক বিদ্যালয়ই চেয়েছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তব করেছেন। অন্ধকারের বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যের আলোতে এসে প্রযুক্তি আর প্রগতির রাজপথ খুঁজে পাক কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল যেন না হয়ে যায়। ফিরিঙ্গি সংস্কৃতি যেন চরিত্র নষ্ট না করে দেয়। মেধাবী, প্রতিভাবান মধুসূদনের মতো শেষে যেন আক্ষেপ করতে না হয়,

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
এজন্য; তা সবে আমি অবহেলা করি
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারি তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?

১৮২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের বছরে বিরোধীতার প্রবল ঝড় মাথায় নিয়ে নিজস্ব নতুন ভবনে মাঘ মাসের ১১ তারিখে রাজা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রহ্ম সমাজ'। ট্রাস্টডিডে অনেক কথার শেষে এই কথা রইল— promotion of charity, morality, piety, benevolance, virtue and strenghening of the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds.

শ্রীরামপুরের পাদরিরা ভেবেছিলেন বড়ো মানুষ রামমোহন খ্রিস্টান হয়ে তাঁদের পথ খুলে দেবেন, সে আশার আলো নিভে গেল, তিনি ব্রাহ্মসমাজ করলেন, একেশ্বরবাদী, স্পষ্ট বলে দিলেন, আমি যিশুকে মানতে রাজি থাকলেও, তোমাদের 'তিন যিশু—ট্রিনিটি' আমি মানি না। আমি এক ঈশ্বরের

বিশ্বাসী, অলৌকিক ব্যাপার আমার বুদ্ধিতে আসে না। তোমাদের অভিযোগ, আমি ব্রহ্মকে মানতে গিয়ে মায়িক জগৎকে অস্বীকার করছি, আদৌ তা নয়। আমি বলছি—ঈশ্বরে সব আছে, কোনো কিছুতেই ঈশ্বর নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর আছেন। আমি তোমাদের বাইবেল নয়, মূল হিব্রু আর গ্রিক ভাষা থেকে বাইবেল অনুবাদ করাচ্ছি, তোমাদের প্রচারিত 'ত্রিত্ব' সেখানে নেই। খ্রিস্টকে আমি পূজা করব অন্য কারণে—তিনি প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাঁর ধর্মের মূলকথা ছিল একেশ্বরবাদ। তোমাদের মতো, গড, সান অফ গড, হোলি স্পিরিট—এই ত্রিত্ব আমি বিশ্বাস করি না। যিশুই ভগবান, পাপদগ্ধ মানুষের পাপভার নিজে গ্রহণের জন্যে জন্মেছেন, যাকে তোমরা 'অ্যাটোনমেন্ট' বল—এ তোমাদের প্রচার, আমি বিশ্বাস করি না।

অতঃপর কলকাতায় এলেন সুবিখ্যাত সেই মিশনারি—আলেকজাণ্ডার ডফ। ব্রাহ্মসমাজ আগে যে বাড়িতে ছিল সেই ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে ডাফ সাহেবকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজা চলে গেলেন বিলেতে, আর ফিরে এলেন না। মিশনারী ডাফের মহৎ উদ্দেশ্য—ইংরিজি শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচার। তিনি তাঁর শিকার ধরতে শুরু করলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিস্টান হলেন। তারপরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশচন্দ্রের ভাই কালীমোহন ধর্মান্তরিত হলেন। হেদুয়ার কোণে তাঁর জন্যে চার্চ তৈরি হল। এইখানেই বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রিস্টান হয়ে তাঁর মেয়ে কমলামণিকে বিয়ে করলেন।

১৮৪৩ সাল। ষড়দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। হঠাৎ মধুসূদন নিরুদ্দেশ হলেন। খোঁজ খোঁজ। শোনা গেল, তিনি খ্রিস্টান হবেন। পিতা রাজনারায়ণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। লাঠিয়াল নিয়ে ধেয়ে এলেন। মধুসূদন আশ্রয় পেলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। ১৮৪৩-এর ৯ ফেব্রুয়ারি মিশন রো-র ওল্ড মিশন চার্চে আর্চডিকন ডিয়াল্ট্রি তাঁকে খ্রিস্টান করলেন। মধুসূদন হলেন মাইকেল। সেই দিনই কবিতায় লিখে ফেললেন তাঁর উচ্ছ্বাস,

Long sunk in superstitions night
By sin and satan driven

কেন খ্রিস্টান হলেন? পরিত্রাতা যিশুকে ভালবেসে। না ভালোবেসেছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপসি, বিদুষী দ্বিতীয় কন্যা দেবকীকে।

প্রেম আর ইংল্যান্ড। বিলেত যেতে হবে। সুন্দরী দেবকীর পাণিগ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর প্রেমে পড়া নেই। তাঁর আছে সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে জ্ঞানের বাতি নিয়ে পথ চিনে চিনে ঘুরে বেড়ানো। তাঁর প্রেম সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে। বাইরের দরজা খুললেই ভয়ঙ্কর কোলাহলের শব্দ। নতুন চিন্তাস্রোত ভীষণ তরঙ্গ তুলে নৃত্য করতে করতে চারিদিকে প্রবাহিত। আতঙ্কে প্রবীণ সমাজরক্ষকরা সমস্বরে বলছেন, সামাল সামাল ডুবল তরী। কিন্তু রাস্তার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির আলোকচ্ছটায় বসে পাঠরত কে ওই শুষ্ক জ্ঞান তাপস। সংস্কৃত ভাষার 'যমক' চাতুর্যে বিভোর',

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগ তপঙ্কজম।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
সুরভিং সুমনোভরৈঃ

আহা! এই রচনাটি যে আরো সুন্দর,

নসমা নসমা নসমা নসমা
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।

হায় প্রেম! সুন্দরী নায়িকা দেবকীকে মাইকেলের জীবন থেকে সরিয়ে নিলেন তাঁর চতুর পিতা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন—'His (মধু) hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud'. চিরপ্রেমিক মধুসূদন চিরতরে আহত। They ask me why I fade and pine?

That cruel-that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not, why thus I pine and fade,
And why of thus I moan.

অন্তর্বেদনার এই আর্তস্বর একদিন চিঠি হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে আসবে। মাইকেল তখন ট্রাজেডির নায়ক Fading flower, সম্মুখে সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি। 'you know, my dear Vidyasagar, that I have no friend except yourself. I leave my wife and two infants in this strange part of the world; [London] should any thing happen to me

during the voyage, remember that they will look to you for help, comfort and friendship. I am obliged to leave some debts behind.

'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে সাহায্য না করলে মধুসূদন কখনোই ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরতে পারতেন না। হয়তো অর্থাভাবে বিদেশের কোনো কারাগারে অথবা 'চ্যারিটি হাউসে' তাঁর জীবন শেষ হত। প্রিয় পত্নী হেনরিয়েটা ও দুটি শিশুকে কলকাতায় রেখে মধুসূদন বিলেত গেলেন। বৈষয়িক ব্যাপার দেখার জন্যে যাঁদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তাঁদের নিষ্ঠুর উদাসীনতায় হেনরিয়েটা অসহায় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁকেও বিলেতে যেতে হল। গোটা একটা পরিবারের খরচ চালাবার মতো সঙ্গতি মধুসূদনের ছিল না। একেবারে কপর্দকশূন্য। হেনরিয়েটা সন্তানসম্ভবা। অলঙ্কার, বস্ত্র, গৃহসামগ্রী সব সরকারি বন্ধক অফিসে বাঁধা পড়ল। অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের জন্যে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ রুপোর যে পানপাত্রটি উপহার দিয়েছিলেন, সেটিও বাঁধা পড়ল।

এত দুর্দিনেও ফরাসি ভাষা, ইটালিয়ান,জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ভাষা শিখতে পারবেন বলে আর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে বলে ফ্রানসের ভার্সাইতে এসেছিলেন। দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁচেছেন। পাথেয়র অভাবে ইংল্যান্ডে ফিরতে পারছেন না। কোনো কোনো দিন সপরিবারে অনশন। বিদ্যাসাগরের কাছে করুণ আবেদন এসেছে—I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution. ভারতে টাকা পাঠাবার সবরকম ব্যবস্থা করে আসা সত্ত্বেও এই শোচনীয় পরিণতি।

এক দয়াবতী ফরাসি মহিলা অসহায়ের সহায় হয়ে জেল বাঁচালেন। সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র হয়ে পড়েছেন অথচ মর্যাদা হারাবার ভয়ে সাহায্য চাইতে পারছেন না, এইরকম অসহায় মানুষদের গোপনে সাহায্য পাঠাতেন কোনো কোনো ফরাসি দাতব্য সমিতি। মধুসূদনের দুর্দশার খবর পেয়ে এইরকম একটি সমিতি মধুসূদনের দরজার বাইরে চুপিচুপি খাবার আর শিশুদের জন্যে দুধের বোতল রেখে যেতেন।

এভাবে তো চলতে পারে না। অনেক আশা নিয়ে ব্যারিস্টার হবেন বলে গ্রেজ ইনে প্রবেশ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। মধুসূদনের যে লাইফস্টাইল তাতে ব্যারিস্টার না হলে চলে না। বড়োলোকের

ব্যাপার। মজার ব্যাপার। চার বছরের ব্যাপার। প্রত্যেক বছর চারটে করে টার্ম। প্রত্যেকটার এক একটা নাম—হিলারি, এস্টার, ট্রিনিটি আর মাইকেলমাস। প্রত্যেককে বারোটা টার্ম শেষ করতে হবে। বারোটা টার্ম মানে গ্রেজ ইনের হলে বাহাত্তরটা ডিনার খেতে হবে। মাইকেল যখন চিঠি লিখছেন তখন তাঁর তিরিশটা ডিনার খাওয়া হয়েছে। আরো বিয়াল্লিশটা খেতে হবে। 'আমি তিনটে টার্ম নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি অর্থাভাবে। আপনি সাহায্য না করলে আমার ব্যারিস্টার হওয়া হবে না। মেঘনাদ বধের রামের মতো বিলাপ করতে হবে—বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।

মধুসূদন বড়ো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন বিদ্যাসাগরের চরিত্র—genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother. প্রাচীন ঋষিদের মতো প্রতিভা ও জ্ঞান, ইংরেজদের মতো প্রাণ-শক্তি আর বাঙালি মায়ের হৃদয়।

সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের কাছে টাকা ছিল না। ধার করে পনেরোশো টাকা পাঠালেন। মধুসূদন চিঠিতে লিখলেন, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে একটি কারণে—ভারতে ফিরে গিয়ে স্বদেশবাসীকে বলব—you are not only Vidyasagar, but karunasagara. বিদ্যাসাগর-করুণাসাগর।

অন্যায়ের শত্রু

মধুসূদন তর্কালঙ্কার পরলোক গত হলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হল। প্রত্যাশী অনেক। মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বিলক্ষণ চিনেছিলেন। অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা, দুর্দমনীয় অধ্যবসায়, আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, অপূর্ব হস্তাক্ষর, রচনা-নৈপুণ্য, সর্ব বিষয়ে সমান অনুরাগ।

ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া শেষ করে, উপাধি লাভ করে বীরসিংহে মায়ের কাছে। সেই ঝিলের ধারে বিরাট মাঠ। যাদের জন্যে বর্ণপরিচয়, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, শব্দমঞ্জরী লিখবেন, তাদের সঙ্গে কাবাডি খেলছেন। মার্শাল সাহেবের দূত বড়ো বাজারে ঠাকুরদাসের কাছে এসে বললেন, ঈশ্বরকে যত তাড়াতাড়ি পারেন কলকাতায় নিয়ে আসুন। ঠাকুরদাস নিজে গেলেন।

সেই পথ ধরে পিতাপুত্র কলকাতায় আসছেন, যে-পথে প্রথম কলকাতায় আসতে আসতে বালক মাইলপোস্ট দেখে দেখে ইংরিজি সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন। সেই বালক আজ যুবক, বিশিষ্ট অধ্যাপক। ঠাকুরদাসের পাশে পাশে হাঁটছে তাঁর জীবনের জীবন-স্বপ্ন। ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন। ঠাকুরদাস সাগর নিয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাদুড়বাগানে ঈশ্বরচন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,

'আজ সাগরে এসে মিললাম।'

বিদ্যাসাগর॥ তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ॥ না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র!

সাল ১৮৪১, বছর শেষ হতে চলেছে, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন। মাসিক বেতন, পঞ্চাশ টাকা। বিলেত থেকে যে-সব সিভিলিয়ান আসতেন তাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেশীয় ভাষা শিখতেন। তারপর একটা পরীক্ষা হত। পাশ করতে পারলে চাকরি। না পারলে ফিরে যাও দেশে।

বিদ্যাসাগর মশাই এই পরীক্ষা নিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, আগ্রহ ও আন্তরিকতায় মার্শাল সাহেব মুগ্ধ। এই অসাধারণ মানুষটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ক্রমশই বাড়ছে। পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারতেন না, তাঁদের মাথা হেঁট করে বিলেতে ফিরে যেতে হতো। সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে একদিন বললেন, 'পরীক্ষার আঁটসাঁট ভাবটা একটু কম করলে কেমন হয়'।

ঈশ্বরচন্দ্র গম্ভীর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি দিতে পারব না, বরং চাকরি ছেড়ে দেবো।' ঈশ্বরচন্দ্র যে-কারণে ঈশ্বরচন্দ্র এই তার সূত্রপাত। তেজস্বী ব্রাহ্মণ। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোস করেননি।

'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার!
[সত্যেন্দ্রনাথ]

একেই তো বলে সভ্যতা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিলেতের সায়েবরা সিভিলিয়ান হওয়ার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি পড়ছেন। 'পণ্ডিত ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট।' পাশ করা খুব কঠিন। ফেল করলেই 'ব্যাক হোম'। দীর্ঘ পথ। দীর্ঘ সময়। সমুদ্রের মর্জি। অর্থাৎ সাগরের মর্জি। বিদ্যার সাগর কৃপা না করলে লবণ সমুদ্রে দোল খেতে খেতে দেশে ফেরা।

কলকাতা থেকে জিব্রালটার, এক মাস প্রায়। সেখানে জাহাজ বদল। ভূমধ্যসাগর। উত্তর আফ্রিকার পাশ দিয়ে মাল্টা, আলেকজান্ড্রিয়া ছুঁয়ে বত্রিশ দিন পরে ইংল্যান্ড।

ঈশ্বরচন্দ্র থেমে থাকার মানুষ কি? 'হয়ে গেল' শব্দটি তাঁর অভিধানে নেই। তিনি নিজেও ছাত্র। ইংরিজি আর হিন্দি শিখছেন। বিদ্যাসাগরের একটি দিনে ক'ঘন্টা ছিল ঘড়ি মাপতে পারবে না। সে এক বিশেষ মাপের বিচিত্র জীবন ঘড়ি। সকালে নটা পর্যন্ত এক শিক্ষকের কাছে ইংরিজি আর সন্ধেবেলা এক শিক্ষকের কাছে হিন্দির পাঠ। আবার পাঠের 'এক্সচেঞ্জ'। সে আবার কী! ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধু- লাভ হয়েছে। তাঁরা সবাই ইংরিজি জানা কৃতবিদ্য পুরুষ—শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সবাই বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত শেখেন। রাজকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার ভাই মেঘদূত পড়ছিল, আমি মোহিত। তুমি আমাকে সংস্কৃত শেখাও।'

'তাহলে তুমিও আমাকে ইংরিজি পড়াও। আমি তোমাকে পণ্ডিত করি। তুমি আমাকে ইংরেজ করো।'

একদিনে

এই চুক্তি করে রাজকৃষ্ণবাবু চলে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভাবছেন, বললুম তো, সংস্কৃত শেখাব, রাজকৃষ্ণের যা বয়েস মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিখতেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে। যে ভাবেই হোক, এই মুগ্ধবোধকে কাবু করতেই হবে।

পরের দিন রাজকৃষ্ণ যথাসময়ে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। তুমি কাল চলে যাওয়ার পর বসেছিলুম, এই দেখে উঠে এলুম— তোমার জন্যে একটা ব্যাকরণ লিখে ফেলেছি।

রাজকৃষ্ণ অবাক। বাঙলা অক্ষরে বর্ণমালা থেকে শুরু করে সংক্ষিপ্ত অপূর্ব একটি ব্যাকরণ। এইটিকেই ভিত্তি করে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হল 'উপক্রমণিকা'। সংস্কৃত শিক্ষার জগতে এক আলোড়ন। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্চর্য প্রমাণ। এর সমগ্র পদ্ধতিই এক নতুন ব্যাপার। এই একখানি গ্রন্থই তাঁর বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নে করিতেছে।'

রাজকৃষ্ণবাবু মাত্র ছমাসে মুগ্ধবোধ আয়ত্ত করেছেন—এই অশ্রুতপূর্ব ঘটনায় পণ্ডিতসমাজ অবাক। এইখানেই শেষ নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এরপর শুরু হল গুরু-শিষ্যের দিবারাত্র পরিশ্রম করে আড়াই বছরে রাজকৃষ্ণবাবু 'সিনিয়ার' পাশ করলেন। প্রথম বার মাসিক পনেরো টাকা, তারপরে প্রথম শ্রেণির বৃত্তি কুড়ি টাকা। আড়াই বছরে! এও কী সম্ভব! দলে দলে ছাত্র আর শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণবাবুকে দেখতে আসছেন। ঈশ্বরচন্দ্র এক অলৌকিক 'মা পাখি'। কত শাবককে এইভাবে উড়তে শিখিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন জীবনের আকাশে।

অভাজনে অন্ন দিয়ে-বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার। [সতেন্দ্রনাথ]

ঈশ্বরের ঈশ্বর

অসার সংসার নাহি পারাবার; দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণোদ্যমে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করলেন। ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হল 'ব্রাহ্মধর্ম'। ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, এক অনাদি অনন্ত পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। তিনি নিয়ন্তা। তাঁরই নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। সমস্ত জীব তাঁতেই প্রকাশিত হয়ে তাঁতেই লয় হচ্ছে, যেমন জলের বিম্ব জলেতেই মিলায়। প্রকাশ আর অপ্রকাশের মাঝে যে সময়টুকু পড়ে আছে তারই নাম অস্তিত্ব। যতক্ষণ ততক্ষণ। এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই জগৎ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হতে নিঃসৃত। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

অতঃপর! ঈশ্বরচন্দ্র বলছেন, 'নানা বিষয় নিয়ে নানা রকমের মতভেদ। অন্তর্কলহ। বহু রকমের অপ্রিয় ঘটনা। শান্তির খোঁজে এসে প্রবল অশান্তি।

আমার মতের সঙ্গে কারোর মতের মিল হয় না। আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলে এ পথে চললে, নিশ্চয় তাঁর প্রিয়পাত্র হব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করব এ সব বুঝিও না। আর লোককে তা বোঝাবার চেষ্টা করো না, আমিও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কী ফ্যাসাদে পড়ে যাব। এক তো নিজে কত শত অন্যায় কাজ করে নিজের পাপের বোঝা ভারী করে রাখছি, আবার অন্যকে পথ দেখাতে গিয়ে তাকে বিপথে চালিয়ে কি শেষটা পরের জন্যে বেত খেয়ে মরব? নিজের জন্যে যা হয় হোক পরের জন্যে বেত খেতে পারব না বাপু। নিজে যেমন বুঝি সেই পথে চলতে চেষ্টা করি। পীড়াপীড়ি দেখলে বলব—এর বেশি বুঝতে পারি না।

কেশবচন্দ্র সেন। দেবেন্দ্রনাথের অতি প্রীতিভাজন।

'তাহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটি সুন্দর মূর্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার স্নেহ ও প্রেম সহজেই যাইত।'

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির এত ঘনিষ্ঠতা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র এবং আরো কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করলেন।

বছর ছয়েক পরে কী হল, মহর্ষি পরমপ্রিয় প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় কেশবচন্দ্রকে মনে করতে লাগলেন 'কাল সর্প'। 'কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে।'

কেশবচন্দ্র লিখলেন, 'আমি কাল সর্পের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া আছি, আমায় দূর করিবার যতই চেষ্টা হইবে ততই আমার দংশনে সকল লোক গরলাভিষিক্ত হইবে।'

শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র ভেঙে বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।' একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশিভূষণ বসু সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পিতা চাঁদমোহনকে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বাড়ির চারপাশে প্রায় আধঘন্টা ঘুরপাক খাচ্ছেন। বাড়িটা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। শেষে বৃদ্ধ মৈত্রমহাশয় নিজেই একজনকে জিজ্ঞেস করে বাড়ি খুঁজে বের করলেন। বিদ্যাসাগরমশাই বৃত্তান্ত শুনে শশিভূষণকে বললেন, 'তুমি এই কাছেরই একটা বাড়িতে থাকো অথচ বৃদ্ধ মৈত্রমশাইকে আমার বাড়িতে আনতে এত বেগ

দিলে! তুমি মানুষকে পরলোকের পথ কীভাবে দেখাও হে। এখান থেকে এখানে, তাই যখন তোমার এত গোলযোগ, তুমি সেই অজানা পথে লোক চালান দাও? আমি বুঝেছি, ও ব্যবসা তুমি তাড়াতাড়ি ত্যাগ করো। ও তোমার কর্ম নয়। যার জানা পথে এত গোল, সে অজানা পথে না জানি লোকের কত দুর্দশাই করছে। তুমি বাপু ও কাজ আর কোরো না।'

বাদুড়বাগানের বাড়িতে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছেন। এমন সময় সেই অন্ধ ফকির অখিলদ্দিন পথ দিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্রের কানে এল গানের প্রথম চরণ,

কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্লয় করবে রে কে;

ঈশ্বরচন্দ্র কথা বন্ধ করে বললেন, 'ডাকো ডাকো। শিগগির ডাকো ওকে।' অখিলদ্দিনকে সামনে বসিয়ে বললেন, 'গাও, গাও ভালো করে গাও।'

কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন,
নির্লয় করবে রে কে,
তুমি কোনখানে খাও কোথায় থাক রে, মন অটল হয়ে
কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন।
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।
তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা
তুমি আপনি অসার আপনি হও সার
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনারা।

ঈশ্বরচন্দ্র গান শুনছেন, দুচোখে অবিরল জলের ধারা। ওই জায়গাটা গাও, আর একবার গাও,

আপনি তারা আপনি সারা, আপনি জড় আপনি মরা,
আপনি হও সে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে শ্মশান কর্তা গো
আপনি হও সে জলের মীন ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো সাকিন
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ!

ঈশ্বরচন্দ্র ফকিরকে টাকা দিলেন। অখিলদ্দিন মাঝে মাঝেই আসতেন গান শোনাতে। ঈশ্বরচন্দ্রকে কাঁদাতে।

স্যার জন লরেন্স জাহাজ ডুবে গেল। আটশোজন যাত্রী এক কালে জলমগ্ন। এই সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত আহত হলেন। দু'চোখে জল। ঈশ্বরের প্রতি টসটসে অভিমান—দুনিয়ার মালিকের এ কী কাজ। একসঙ্গে সাত আটশো লোককে ডুবিয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন। এইসব ঘটনা দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না—দুনিয়ার মালিক বলে কেউ আছেন।

বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্র ছিলেন যোগী। বারাসাতে একটি কুটিরে নির্জন-বাস করতেন। বিদ্যাসাগরমশাই মাঝে মাঝেই সেখানে চলে যেতেন। কয়েকদিন সেই তপোভূমিতে কাটিয়ে ফিরে আসতেন কলকাতার কর্মজীবনে।

ব্রাহ্মসমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিজয়কৃষ্ণ একদিন বলছেন, 'অনেকের অভিযোগ, 'বোধোদয়' ছোটোদের এমন সুন্দর একটি পাঠ্যপুস্তক, সেখানে সব আছে, নেই কেবল ঈশ্বরের কথা!' ঈশ্বরচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, 'তাঁদের বোলো পরের সংস্করণে থাকবে।'

পরের সংস্করণে পাওয়া গেল, 'ঈশ্বর : কী চেতন কী অবচেতন, কী উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা, সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা!'

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর মন্দিরে থাকেন না। তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কে অভিমত অনেকটা এইরকম,

দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে হল দানবের বাড়া,
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া।
[যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

রণসজ্জায় সজ্জিত অশ্বারোহী নেপোলিয়ান

১৮৪২, ১জুন। কলকাতার রাজপথে শকটবাহিত একটি শবাধার। কলকাতার কয়লাঘাটের গ্রে সাহেবের ইমারত থেকে প্রকাশিত হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে আসছে। শবাধার যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল তখন গাড়িতে ও

পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে না। বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ জনতার প্লাবনে নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে শহরের পথে যেমন শোকের বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন।

'এইরূপে সুর নরে মিলিয়া হেয়ারের জন্য শোক করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত করা হইল; ওদিকে প্রবল ঝড়ে কলকাতা শহর কাঁপিয়া গেল।' স্কটল্যান্ড থেকে কলকাতায় এলেন, ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্রে ঘড়ির ব্যবসা করবেন। বিরাট মনের মানুষ। হৃদয়বান। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, ভীষণ অন্ধকার। ভালো ভালো মানুষ, ভালো উপাদানে তৈরি। উন্নত শিক্ষার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দোকান যেই আসতেন ঘড়ি কিনতে অথবা মেরামত করতে হেয়ার সাহেব বলতেন, বোঝাতেন উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ইংরিজি শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এদেশের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ইংরিজি শিক্ষার প্রবক্তা রামমোহন রায়ের সঙ্গে হৃদ্যতা হল। ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে নেমে পড়লেন বঙ্গ-জীবনের উন্নতি সাধনে।

রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভার অন্যতম সদস্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈষ্টের কাছে একটি ইংরিজি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবটি নিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু কলেজ'। হেয়ার সাহেব কমিটির একজন সদস্য হলেন। ডাক্তার উইলসনের পরামর্শ আর হেয়ারের প্রাণপাত পরিশ্রমে হিন্দুকলেজ একটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল।

যে-বাড়ি থেকে শবাধার বেরল, সেই বাড়ি থেকে রোজ সকালে বেরিয়ে আসত একটি পালকি। আরোহী ডেভিড হেয়ার। প্রথমে যাবেন এই তিনটি জায়গায়, ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আরপুলী। নিজের উপার্জিত অর্থে এই সব জায়গায় স্থাপন করেছেন পাঠশালা আর স্কুল। খুঁটিনাটি সমস্ত খবর নেবেন। ছেলেরা ঠিকমতো আসছে কি না। মন দিয়ে লেখাপড়া করছে কি না। কোন কোন স্কুলের কোন কোন ছেলে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন স্কুলে আসছে না, তার একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল।

হেয়ার সাহেবের পালকি

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় একটি পালকি। এঁদো গলি, কানা গলি, চালা বাড়ি, ভাঙা বাড়ি, সর্বত্র হেয়ার সাহেব। ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করছেন দীনজনের বন্ধু ডেভিড হেয়ার। কলকাতার বালকদের একমাত্র অভিভাবক। সবশেষে হিন্দু কলেজে। প্রত্যেকটি শ্রেণির প্রত্যেক বালকের কাজ দেখতেন। 'স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের যে কী প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত, যে তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্ন শ্রেণির শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ঐ বল ঊর্দ্ধে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদলের মধ্যে দাঁড়াইতেন, তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কেহ কোমর জড়াইত, কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত, কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত।'

চিরকুমার ডেভিড হেয়ার অপূর্ব একটি জীবনের ইতিহাস এদেশে ফেলে রেখে একদল বিদেশিকে চোখের জলে ভাসিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এক শ্বেত সন্ন্যাসী। ১৮৪২ সালের ৩১ মে রাত একটা সময় আক্রান্ত হলেন কলেরায়। তাঁর একমাত্র সঙ্গী তাঁর প্রিয় বেহারাকে বললেন, 'গ্রে সাহেবকে গিয়ে আমার জন্যে কফিন আনাতে বল'। রাত কাটল। সকালে ডাক্তার এলেন। তাঁরই প্রিয় ছাত্র, মেডিকেল কলেজ থেকে সুযোগ্য ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন, প্রসন্নকুমার মিত্র। তিনি বিধিমতো প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খবর ছড়ানো মাত্র বন্ধু-বান্ধবরা এসে পড়লেন। নানাভাবে চিকিৎসা চলতে লাগল। তখন কলেরা হলে সর্বাঙ্গে ব্লিস্টার লাগানো হত। কিছুতেই কিছু হল না। রোগ ক্রমশই বাড়ছে। একসময় হেয়ার সাহেব বললেন, 'প্রসন্ন! আর ব্লিস্টার দিও না, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।'

পয়লা জুন। সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গার ধারেই তাঁর বাড়ি। দিন শেষ হল। সূর্যোদয় আর দেখা হবে না। সারা উত্তর কলকাতায় হাহাকার। ঘরে ঘরে রমণীদের আর্তনাদ, ক্রন্দন। দরিদ্র বালকের দল, যাদের তিনি পালন করতেন, তারা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে তাঁর বাড়ির দিকে। সন্ধ্যায় আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঝড় আসছে।

কলকাতার বড়ো বড়ো মানুষ, যত স্কুলের ছাত্র সমবেত। হিন্দুসমাজের শীর্ষ- স্থানীয় রাধাকান্ত দেবও এসেছেন। কথা উঠল, তাঁর সমাধি কোথায়

হবে। খ্রিস্টিয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। খ্রিস্টিয় সমাধিক্ষেত্রে স্থান হবে না। তাঁরই দেওয়া জমিতে হিন্দুকলেজ। কলেজ-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে সমাহিত হলেন ডেভিড হেয়ার সেই ভীষণ ঝড়ের রাতে।

১৮৩১ সালের, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ডেভিড হেয়ারের জন্মদিনে, হেয়ার স্কুলে, ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অসংখ্য ছাত্র সম্মিলিত হয়ে গুরু হেয়ারকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি অভিনন্দন পত্র। অভিনন্দন পত্রটি পার্চমেন্টের উপর হরচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করে সুন্দর একটি বক্তৃতা করেছিলেন, বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের জননীর মতো স্তন্য দিয়েছেন।' প্রতিভাষণে হেয়ার বললেন, 'এদেশে এসে দেখলাম, এখানে নানা রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে, ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অক্ষয়, মানুষও বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী, অন্যান্য সভ্য দেশের মানুষের মতো ক্ষমতাবান; কিন্তু বহুকাল ধরে কুশাসন ও প্রজাপীড়নে এদেশের মানুষ অজ্ঞানতায় আবৃত। এদেশের অবস্থা সংশোধনের জন্যে ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক। যে বীজ আমি উপ্ত করেছি, তা এখন বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল দান করছে, তার সাক্ষী আজ আমার চারপাশে।'

সেই নেপোলিয়ান

'রণসজ্জায় সজ্জিত অশ্বারোহী নেপোলিয়ানের ন্যায় দিবারাত্রি প্রস্তুত থাকিতেন।' কিন্তু তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র ছিল অন্য রকম, সাগুদানা, মিছরি, বেদানা, কিসমিস। এসব হল বাইরের অস্ত্র। আর বিদ্যাসাগরের মনের অস্ত্র, স্নেহ-মমতা, সেবা-শুশ্রূষা, ছোটাছুটি, ডাক্তার ডাকাডাকি। এই উভয়বিধ আয়োজন তাঁর নিত্যযুদ্ধের সম্বল।

হেয়ার সাহেবের শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর-মশাই আসছেন, এ এক মহাসংবাদ। সঙ্গে আসছে রুগিদের জন্যে ওষুধ, অভাবী মানুষদের জন্যে নতুন কাপড়ের বস্তা, আর টাকার থলি। সেই থলিতে চকচকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি আর পয়সা। দরিদ্রজনের তিনটি অভাব, ওষুধ, অন্ন আর বস্ত্র। বীরসিংহের বাড়িতে বিদ্যাসাগর এসেছেন। পরিবার

পরিজন যত না আনন্দিত, আশপাশের গ্রামের মানুষের আনন্দ শতগুণ বেশি। দু হাতে দান। নাম কেনার জন্যে লোক দেখানো দান নয়। প্রাণ যে কাঁদে।

এই প্রাণ মাতা ভগবতীর দান। যাঁরা জানেন, তাঁরা বলেন, ভগবতী দেবী মানব শরীরে প্রকৃতই দেবী ভগবতী। বিচিত্র উপাদানে গঠিত। পরিশ্রমে অকাতর। অক্লান্ত এক সেবিকা। দ্বিপ্রহর বেলায় সকলকে আহার করিয়ে তিনি কিন্তু আহারে বসলেন না। অনশনে অপেক্ষা। কার জন্যে? বলা তো যায় না। যদি কোনো উপবাসী অতিথি অথবা কোনো দরিদ্র মানুষ হঠাৎ এসে হাজির হন। প্রায়ই এমন রবাহূত কেউ না কেউ আসবেনই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের আহার্য তাঁকে নিবেদন করে দিলেন। তারপর! হয় উপবাস, অথবা পুত্রবধূদের কেউ একজন আবার রান্না চাপালেন। ভগবতীদেবী অপরাহ্ণে আহারে বসলেন।

দ্বিপ্রহরে ভগবতীদেবী গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। বাজার ফেরত কোনো লোক স্নানাহার না করে সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছেন কি? এত বেলা হল, তুমি না খেয়ে যাবে কী? এসো, এসো। স্নান করো। এক মুঠো খেয়ে যাও।

দরজায় দাঁড়িয়ে অভুক্ত মানুষদের আপ্যায়নে ঈশ্বরচন্দ্র-জননী সন্তুষ্ট থাকবেন, তা কী হতে পারে! তাঁর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত। পাড়া থেকে পাড়ায় ভ্রমণ। কে কেমন আছে, কার কী অসুবিধে! ঘরেঘরে অনুসন্ধান। মানুষের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। স্থির থাকতে পারতেন না। বিপন্ন মানুষের পাশে কেউ নেই, তিনি আছেন। নিরন্তর পরসেবা। জাতবিচার নেই। পীড়িতের পথ্যের ব্যবস্থা করছেন। পাশে বসে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। পথ্য করে দেওয়ার কেউ নেই। সঙ্গে সাগু আর মিছরি এনেছেন, কে করবে! ফিরে এলেন বাড়িতে। সাগু তৈরি করে রুগিকে খাইয়ে তবে শান্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র মাকে ছ'খানা লেপ পাঠালেন কলকাতা থেকে। ভগবতীদেবীর খুব আনন্দ। ছেলে পাঠিয়েছে নতুন লেপ। আঃ! শীতে এবার খুব আরাম। প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, তারা শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। গরম কাপড় কেনার সঙ্গতি নেই। একটি নতুন লেপ তাদের দিলেন। হাত রইল পাঁচ। একে একে সবকটা লেপই দান হয়ে গেল। ভগবতীদেবী পুত্রকে লিখলেন, 'ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতবিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।'

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা থেকে লিখলেন, 'মা! ঐরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে

ও বাড়ির লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখা'ন লেপ রাখিতে হইলে, সর্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে।'

হ্যারিসন সাহেব

ঈশ্বরচন্দ্রের 'মেটাল' বাঙালি কী বুঝবে! বুঝেছিলেন সেকালের উদার হৃদয় ইংরেজরা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মার্শাল সাহেব অধীনস্থ বিদ্যাসাগর-মশাইকে যখন অনুরোধ করলেন, সাহেবদের ভাষা পরীক্ষার ব্যাপারটা যদি একটু সহজ করা যায়। সাত সমুদ্র পেরিয়ে 'সিভিলিয়ান' হওয়ার জন্যে সব আসে। ফেল করলেই কাঁদতে কাঁদতে আবার সমুদ্র পেরিয়ে দেশে ফিরে যেতে হয়।

পরীক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'ওটি আমাকে দিয়ে হবে না।'

রবীন্দ্রনাথ দুটি অতি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করলেন, 'অজেয় পৌরুষ', 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' বাঙালি হলে বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে 'দেখে নিতেন'। মার্শাল সাহেব মানুষটির আরো কাছে সরে এলেন। এই সেই মানুষ—To have the grit to grin at loss, To master life and be its loss.

গর্ভনর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে। বিদ্যাসাগর লর্ড হার্ডিঞ্জকে বললেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যা কিন্তু দিন দিন কমে আসছে। সংস্কৃত শেখার উৎসাহ হারাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। একমাত্র জজপণ্ডিতের পদ ছিল যে পদে উত্তীর্ণরা চাকরি পেতেন। সে-সব পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে সংস্কৃত শিখে লাভ কী? সংস্কৃত কলেজ থেকে যাঁরা পাশ করে বেরুচ্ছেন তাঁদের জন্যে কিছু একটা করা দরকার। লর্ড হার্ডিঞ্জকে বলা হত 'মহামতি'। যেমন ডেভিড হেয়ারকে বলা হত 'মহামতি'। হার্ডিঞ্জ সাহেবের আদেশে ১৮৪৬ সালে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় একশো একটি 'বঙ্গ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল। ঠিক হল সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্ররা ওই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন। ঈশ্বরচন্দ্রের একটি কথায় এত চাকরি তৈরি হল। শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পিত হল ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর। ওই একশো একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ভারপ্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রের শত্রুবৃদ্ধি হল। প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলী ঈর্ষায় জ্বলতে লাগলেন। আমরা থাকতে পরীক্ষা নেবে ঈশ্বরচন্দ্র! আর ঈশ্বরচন্দ্রকে

নিয়ে সমস্যা একটাই। কোনো সুপারিশ ধরাকরা চলে না। পরীক্ষায় যোগ্যতমই নিয়োগপত্র পাবে। ফল হল এই ব্যর্থকাম অযোগ্যরা ঈশ্বরচন্দ্রের নামে যা-তা বলে বেড়াতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লোকনিন্দার পরোয়া করেন না।

এই সত্যনিষ্ঠা, নির্ভিকতা পিতামাতার দান। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'আমার বয়স যখন দশ তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করি। সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার মনে চির জাগ্রত। 'বিদ্যাসাগর' এই কথাটি আমার নিকট একজন মানুষের নাম মাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোর্তিময় আলোকস্তম্ভস্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে।'

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর। [সত্যেন্দ্রনাথ]

হ্যারিসন সাহেব ইনকাম ট্যাক্সের কার্যভার নিয়ে মেদিনীপুরে এলেন—ইয়াং অফিসার। সেইসময় তিনি একবার বীরসিংহ ও তার চারপাশের গ্রাম পরিদর্শনে এলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় বীরসিংহে। ছুটিতে আছেন। মাকে বললেন, 'মা, এক তরুণ সাহেব এসেছেন, সিভিলিয়ান হ্যারিসন।'

মায়ের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের যত খুঁটিনাটি অন্তরঙ্গ কথা।

মা বললেন, 'তা ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়িতে আনবি না। তাকে একবার আমাদের বাড়িতে এনে কিছু খাওয়ালে ভালো হত।'

বিদ্যাসাগরমশাই সাহেবকে বললেন মায়ের অভিপ্রায়ের কথা।

সাহেব বললেন, 'তিনি নিজে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না।'

ভগবতী দেবীর নিমন্ত্রণপত্র সাহেবের কাছে এল। হ্যারিসন এলেন। তিনি বাঙলা বুঝতে পারেন! জননী ভগবতীর কী আনন্দ! সায়েব এদেশের প্রথা অনুসারে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। ভগবতীদেবী তাঁর সাহেব পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। নিজের হাতে তৈরি পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ও অন্ন সাজিয়ে সাহেবকে খাওয়াতে বসলেন। নিজে পাশে বসে দেখিয়ে দিতে লাগলেন কোনটার পর কোনটা খেতে হবে।

এমন 'মায়ের-আদর' বিলেতের মানুষ কোথায় পাবেন। এমন মাতৃমূর্তি! শান্ত সুন্দর, ঢল-ঢল লাবণ্য। দেবীর মতো।

খুব গল্প হচ্ছে। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কত টাকা?'

ভগবতীদেবী উত্তর, 'কেন বাবা, আমার আছে চার ঘড়া ধন।'

সাহেব অবাক! যাঁর চার ঘড়া ধন, তাঁকে তো ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে।

ভগবতী দেবীর চার পুত্র সারি সারি দণ্ডায়মান। তাঁদের দেখিয়ে বললেন, এই যে আমার চার ঘড়া ধন।'

হ্যারিসন ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি সামান্য রমণী নন।'

এমন মা না হলে কী এমন ছেলে হয়?'

আহারান্তে সাহেব চারপাশ ঘুরে দেখছেন। বীরসিংহ অঞ্চলে এক ধরনের মেটে দোতলা হত। অনেকে প্রচুর টাকা খরচ করে এই রকম বাড়িকেই অপূর্ব সুন্দর করে তুলতেন। এ একটা আর্ট। ঈশ্বরচন্দ্রের বিশাল যৌথ পরিবার। বাড়িটিও সেই রকম। ভিটের মাঝখানে তিনি এই রকম কারুকার্যমণ্ডিত একটি দোতলা করিয়েছিলেন। হ্যারিসন সাহেব অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'পাকা বাড়িও এর কাছে হার মেনে যাবে।'

ঘুরে এসে সাহেব বসেছেন। উপাদেয় আহার। শরীরে কিঞ্চিৎ মৌজ এসেছে। উগ্র আবহাওয়া। ভগবতীদেবী সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন, 'দেখ বাছা! তুমি যে কাজ নিয়ে এসেছ, সে বড়ো কঠিন কাজ। খুব সাবধানে করবে। গরিব দুঃখী লোক যেন ধনে-প্রাণে মারা না যায়। তারা যেন তোমাকে আপনার লোক ভেবে সুখী হতে পারে। তুমি সর্বদা সকলের কথা ভালো করে শুনবে। লোকের দুঃখকষ্ট প্রাণপণে দূর করার চেষ্টা করবে। তুমি এখানে এমনভাবে কাজ করে যাবে যে, তুমি চলে যাওয়ার পরেও তোমার নাম এখানকার মানুষ চিরদিন স্মরণে রাখবে। তুমি যেন দুঃখীর বন্ধু হয়ে এখানে থেকে যেতে পারো বাবা!'

হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর-ভবন থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেলেন, 'আমি আপনার বাড়িতে এসে, এখানে আহার করে, সর্বোপরি আপনার মায়ের স্বভাব, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর যত্নে মুগ্ধ হয়েছি। এই দিনটির স্মৃতি আজীবন আমার মনে থাকবে।'

তিনি ভগবতীদেবীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। মেদিনীপুরের মানুষ বহুদিন এই অপূর্ব সিভিলিয়ানকে মনে রেখেছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

গাঁট-গাঁট কাপড়, ঝোলা-ভর্তি টাকা, আধুলি, সিকি। অকাতরে দান। ডাকাতদের সদর দপ্তরে খবর চলে গেল। রাত দুটো। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের সশস্ত্র এক দস্যুদল চড়াও হল ঈশ্বরচন্দ্রের আবাসে। বীরসিংহ নিদ্রার কোলে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে তখন অনেক লোক। পরিবার, পরিজন, অতিথি, অভ্যাগত। সদর দরজা মড়মড়িয়ে ভেঙে ডাকাতরা বাড়িতে ঢুকছে। পিতা, মাতা, পরিবার, পরিজনদের নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন।

ডাকাতরা অনেক অনুসন্ধান করেও ঈশ্বরচন্দ্রকে ধরতে পারল না। পারলে বেশ কিছু টাকা আদায় করে নিত। তাঁকে না পেয়ে বাড়িতে যা কিছু সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু বাড়িটা আর ভাঙা দরজা। মোটামুটি সবই লণ্ডভণ্ড। চল্লিশ পঞ্চাশ জনের সমবেত প্রচেষ্টায়।

বিপন্ন বিদ্যাসাগর সেই রাতেই ঘাটাল থানায় সংবাদ পাঠালেন। 'সকাল বেলায় কলির অবতার ধড়াচূড়া বংশীধারী পুলিশ ইনস্পেক্টর আসিয়া দেখা দিলেন।' তিনি এসে প্রথমেই দক্ষিণার ব্যবস্থা নেই দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। গরম হয়ে গেলেন। প্রবীণ ঠাকুরদাস ইনস্পেক্টার সাহেবকে বললেন, 'আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে বলে আপনার মর্যাদা রাখতে পারি, কিন্তু এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু দিতে পারব না'। এই বলে ঠাকুরদাস উদয়গঞ্জ ও খড়ারে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য থালা, ঘটি, বাটি কিনতে গেলেন। ডাকাতে তো যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র কী করছেন! নিজের ভাইদের আর পাড়ার যুবকদের সঙ্গে সামনের বিস্তীর্ণ মাঠে কপাটি খেলছেন। দারোগামশাই রেগে আগুন। বুড়োটা দক্ষিণার ব্যবস্থা না করে গটগট করে চলে গেল, আর বুড়োর ওই দামড়া ছেলেটা 'কিত কিত' খেলছে।

দারোগা বললেন, 'বামুনটার এত কী জোর, যে আমাকে এক পয়সাও দেবে না বলে ফড়ফড়িয়ে চলে গেল আর ছোঁড়াটারই বা কী আক্কেল! কাল রাতে যার বাড়িতে ডাকাতি হল, সে সাত সকালে কপাটি খেলছে!'

দারোগাবাবুর সঙ্গে ছিলেন পাশের গ্রামের ফাঁড়িদার। তিনি বললেন, 'হুজুর উনি সামান্য লোক নন। উনি বাড়িতে এলে জাহানাবাদের ডেপুটিবাবু এসে সাক্ষাৎ করে কৃতার্থ মনে করেন। শোনা যায়, বড়োলাট আর ছোটোলাটের

সঙ্গেও এঁর বন্ধুত্ব।' দারোগা সাহেবের হম্বিতম্বি সঙ্গে সঙ্গে রূপ পাল্টাল। পরবর্তীকালে ওপরতলার হুকুমে এই দারোগা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গ্রামের বাড়ির রক্ষী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার কর্মকেন্দ্রে ফিরে এলেন। ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কথায় কথায় ডাকাতির প্রসঙ্গ এল। সাহেব বললেন, 'বাড়িতে ডাকাত পড়ল, আর আপনি বাধা না দিয়ে সপরিবারে পেছনের দরজা দিয়ে পালালেন। এ যে ভয়ংকর কাপুরুষতা।' বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা ভারী মজার লোক, প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছি, বলছেন কাপুরুষ। আবার চল্লিশ পঞ্চাশজন দস্যুর সঙ্গে একা লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিলে বলতেন, কী আহাম্মক এত আক্রমণকারীর সামনে একা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে প্রাণটা দিল। আপনাদের মনের মতো কাজ করা ভীষণ কঠিন, এগোলে দোষ, পেছলেও দোষ।'

বিদ্যার সাগর, করুণার সাগর, রসের সাগর

বাল্যকাল থেকেই রসিকতার সুযোগ পেলেই, সে-সুযোগ অবহেলা করতেন না। কলেজের ক্লাস। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ক্লাস নিচ্ছেন। ছাত্রদের বললেন, 'গোপালায় নমোহস্তু মে'—এইটিকে চতুর্থ চরণ করে একটি শ্লোক রচনা করো।

ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করব? এক গোপাল আমাদের সামনে, আর এক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। কোন গোপালকে প্রণাম জানাব?'

ক্লাসে হাসির রোল। পণ্ডিতমশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'বেশ বেশ, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা করো।'

পনেরো বছর বয়সে বিবাহ হচ্ছে দীনময়ীর সঙ্গে। আট বছর বয়েস—'অতি সুলক্ষণা ও দর্শনীয়া এই 'পাদুকা কন্যা'র কোষ্ঠীর ফল উত্তম—এই কন্যা যাহাকে দান করা হইবে, সর্বপ্রকারে তাঁহার অচলা লক্ষ্মী হইবে।' ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বাসর ঘরের অভিজ্ঞতা বলছেন। 'বাসর ঘরে পা দিতে না দিতে আমাকে বললে, 'তোমার কনে খুঁজে বের কর'। কনে খুঁজে বের করতে হবে শুনে মুশকিলে পড়লাম। আমি দেখলাম সেই মেয়ের দঙ্গলের ভেতর থেকে আমার

সেই অপরিচিতা অর্ধাঙ্গিনীকে খুঁজে বের করা আমার কর্ম নয়। ছাঁদনাতলায় একবার একঝলক দেখা। সে দেখা কী আর দেখা! আমি ভেবে চিন্তে শেষে আমারই বয়সের বেশ একটি টুকটুকে ফরসা মেয়েকে ধরে বললাম, 'এই আমার কনে।' যেমন ধরা অমনি মহা গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়ে পালাবে, তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরেছি, তাকে খুবই ধরেছি, তার আর পালাবার উপায় নেই। আমি তার হাত ধরে বললাম, 'তুমিই আমার কনে তোমাকে হলেই আমার ঘর চলবে। আমি আর অন্য কনে চাই না।' সেই মেয়েটি তো বাপরে মারে বলে গেলুম রে বলে চিৎকার শুরু করল। গিন্নিবান্নি গোছের দু-একজন দৌড়ে এলেন, 'ও তোমার কনে নয়, ও তোমার নয়, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।' আমি বললাম, 'ছাড়ব কেন? আমাকে খুঁজে নিতে বলেছে, আমি খুঁজে এইটিকেই বের করেছি। এইটি হলেই আমার বেশ মনের মতো হবে।' সেই মেয়েটি তখন হাতে পায়ে ধরে বললে, 'আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার কনে বার করে দিচ্ছি।'

কুস্তিগীর

ভারতীয় শরীরে ইউরোপীয় মন। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের অবস্থান। খেলাধুলা, ব্যায়াম করতেন। প্রিয় খেলা কপাটি। গ্রামের চ্যাম্পিয়ান। দক্ষ সাঁতারু। তেমন ইচ্ছে হলে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হতে পারতেন। বর্ষার দুরন্ত দামোদর তাঁর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় ও অজেয় মনের কাছে পরাভূত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র শেকসপিয়রকে পছন্দ করতেন যেমন শ্রদ্ধা করতেন সীতাকে। সীতা তাঁর প্রিয় চরিত্র। 'সীতার বনবাসে'র শেষ চারটি লাইন, 'তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মতো দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।'

সাগরতটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিও সীতাদেবীকে পঞ্চবটীতে দর্শন করেছিলেন। 'পঞ্চবটীতলায় বসে একদিন ধ্যানচিন্তা করছি না কিছুই, শুধু বসেই আছি, এমনি বসে থাকা। হঠাৎ দেখি অদূরে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী

স্ত্রীমূর্তি। স্থানটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। মূর্তিটি মানবীর কারণ ত্রিনয়না নন। কিন্তু মুখটি ভারি সুন্দর। সে মুখে প্রেম, দুঃখ, করুণা, সহিষ্ণুতা। অপূর্ব তেজস্বী ও গম্ভীর। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন ধীর পায়ে। অবাক হয়ে ভাবছি, 'কে ইনি?' এমন সময় কোথা হতে একটা হনুমান এসে উ-উপ শব্দে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পদপ্রান্তে। ভেতর থেকে আমার মন বলে উঠল, চিনতে পারছিস না, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা।' 'মা' 'মা' বলে অধীর হয়ে তাঁর পায়ে পড়তে যাব কী, তিনি বিদ্যুৎবেগে আমার শরীরে প্রবেশ করলেন। আমি বাহ্যজ্ঞান হারালাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জনম-দুঃখিনী সীতাকে সবার আগে দেখেছিলাম বলেই বোধহয় তাঁর মতো আজন্ম দুঃখভোগ করেছি।' সীতা দেবীর হাতে ডায়মন কাট বালা দেখেছিলেন। সহধর্মিণী সারদাদেবীকে সেইরকম একটি বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের বাঙলার দুঃখভূমিতে দুই-বীর উঠে দাঁড়ালেন। বিদ্যাসাগর নামলেন সাধনসমরে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসমরে। দু'জনেরই লক্ষ্য— মানবমুক্তি। নারীমুক্তি। নির্যাতনের বহুবিধ যন্ত্র। শাস্ত্র ও সংস্কার এক মহাকল। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি হল ভক্তি। বিদ্যাসাগরের শক্তি—জ্ঞান। দুজনেই অসীম সাহসী। বিদ্যাসাগরমশাই শেকসপীয়র পড়েছিলেন, That's a valiant flea that dares eat his breakfast on the lip of a lion.

দেহে বল চাই তা না হলে মনের বল মনেই মার খাবে। ঈশ্বরচন্দ্র কপাটি খেলছেন। ঈশ্বরচন্দ্র লাঠি ঘোরাচ্ছেন। পিতামহ লৌহদণ্ডধারী। তাঁর নাতি ঈশ্বরচন্দ্র বংশদণ্ডধারী। সকাল-সন্ধে মুগুর ভাঁজেন, ডন ফেলেন, হিন্দুস্থানী পালোয়ানের কাছে ব্যায়াম করেন। সবচেয়ে প্রিয় কুস্তি। তখন তাঁর শরীর কী! 'উন্নত ললাট, তেজঃপুঞ্জ সুন্দর পুরুষ, গণ্ডস্থল গোলাপি আভাযুক্ত।'

ভীষণ পছন্দের ছিল কুস্তি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। কলেজের বাড়িতেই থাকেন। মালির ঘরের পেছন দিকে কুস্তির আখড়া করলেন। কলেজের ঈশান কোণে ঝুলছে প্রকাণ্ড ঘণ্টা। পূর্বদিকে মালির ঘর। ঘরের পেছনে পণ্ডিতদের কুস্তির আখড়া। আখড়ার সদস্যরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ— শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর তারাশঙ্কর কবিরত্ন।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। থরহরি কম্প। ক্লাসে, ক্লাসে পণ্ডিতমশাইদের নিদ্রা মাথায় উঠল। ছাত্রদের ইচ্ছামতো কলেজের বাইরে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত হল। অধ্যাপকদের যথাসময়ে আসার অভ্যাস করালেন। গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যিনি দেরিতে আসছেন তাঁকে একটিই অমায়িক প্রশ্ন 'এই আসছেন বুঝি!'

এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা অবস্থায় শৃঙ্খলা আনার পর শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিলেন। পাঠ্যপুস্তক থেকে সেইসব কবিতা, যা তাঁর অশ্লীল মনে হয়েছিল, সব বাতিল করে দিলেন। পরীক্ষা গ্রহণে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। অন্যান্য বছরের চেয়ে পরীক্ষার ফল যথেষ্ট ভালো হল। সন্তোষ প্রকাশ করলেন দুজন সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত আর শিক্ষাবিভাগের কর্তা ডাক্তার ময়েট।

রসময় দত্ত রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান। সুবিখ্যাত সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতা। পিতা ঈশানচন্দ্র, পিতামহ পীতাম্বর দত্ত। এই পরিবারেরই দুই বিখ্যাত কন্যা তরু দত্ত আর অরু দত্ত। ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখে ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসি ভাষা শিখলেন। স্বদেশে এবং বিদেশে দুই বোনের কবিখ্যাতি স্বীকৃত হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র সরলভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। সাহিত্য শ্রেণিতে অঙ্ক শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় একদিন কোনো একটি কাজে তিনি হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের কাছে গেলেন। অধ্যক্ষ কার টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে অর্ধশয়ান। বিদ্যাসাগরমশাই বিনা অভ্যর্থনায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কাজ শেষ করে নীরবে ফিরে এলেন।

কয়েকদিন পরেই অধ্যক্ষ কার সাহেবকে আসতে হল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে। তিনি এসেছেন শুনেই 'বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সুবঙ্কিম চট্টরাজ পরিশোভিত সুশ্যাম চরণদ্বয় টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া, সাহেবের ন্যায় চেয়ারে হেলান দিয়ে অর্ধশয়ানাবস্থায় অবস্থিত হইয়া, সাহেবকে গৃহমধ্যে আসিতে বলিলেন। বসিবার আর দ্বিতীয় আসন নাই।'

ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ত চাইলেন।

বিদ্যাসাগরমশাই কৈফিয়ত দিলেন, 'আমি ভেবেছিলুম, আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরাজি মতে লোকের অভ্যর্থনা করতে হলে, বুঝি এই রকমই করতে হয়। আমি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের কাছ থেকেই তো আমি এই শিষ্টাচার শিখে এসেছি। সাহেবকে সেই ভাবেই সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছি। যদি মনে করেন এতে আমার দোষ হয়েছে, তাহলে সেই দোষের জন্যে দায়ী আমার শিক্ষক মহামান্য কার সাহেব।'

শিক্ষাসমিতির কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ ও নির্ভীক তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কার সাহেবকে বলেছিলেন, 'যান, বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে আপোষে মামলা মিটিয়ে আসুন।'

তিনি এসেছিলেন। মিটমাট করে গিয়েছিলেন। সেকালের বিলিতি সাহেবদের এই একটা গুণ ছিল। সাহেবদের সঙ্গে 'হেড অন কলিশান' আরো অনেক আত্মসচেতন বাঙালির হয়েছে। তেজি একরোখা বাঙালি 'সাহেব ভজনা' সহ্য করতে পারতেন না। কাঠে কাঠে টক্কর। গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানির বুক কিপার। একদিন সাহেবের চাপরাশি এসে 'বাবু, সাহেব আপনাকে ডাকছেন,শুনতে পাচ্ছেননা?'

গিরিশচন্দ্র মুখ না তুলে কাজ করতে করতেই বললেন, 'না।'

চাপরাশি অবাক হয়ে চলে গেলেন। আর তক্ষুনি পার্কার সাহেব গরম মেজাজে গিরিশচন্দ্রের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'তোমাকে ডাকছি, তুমি শুনছনা কেন?'

গিরিশচন্দ্র ততোধিক গম্ভীর, 'আমি শুনিনি।'

এইভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর গিরিশচন্দ্র বললেন, 'সাহেব, এতক্ষণ আমি ভদ্রভাবে কথা বলছিলুম, এইবার প্রকৃত কথাটা বলি শোনো, তুমি মনে কোরো না, আমি তোমার খানসামা, কী বেয়ারা, তোমার ঘন্টায় উঠব বসব।'

সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেল। পরক্ষণেই বললেন, 'বাবু, আমি দুঃখিত, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রের বন্ধু হয়ে গেলেন। তাঁর কোম্পানির বহু লোকসান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথমভাগ পড়ছেন!

'স্বামীজি আপনি প্রথম ভাগ পড়ছেন?'

'ভাই! প্রথম ভাগ আগে পড়েছি এখন আমি বিদ্যাসাগর পড়ছি।'

ঘটনাটি এইরকম, নরেন্দ্রনাথ বলরামবাবুর বাড়িতে বড়ো ঘরটিতে বসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি প্রথম ভাগ নিবিষ্টমনে দেখছেন। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাটি একমনে পড়ছেন আর চিন্তায় নিমগ্ন। মুখটি অতি গম্ভীর। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, এখন আবার প্রথম ভাগ পড়ছ নাকি?' নরেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত নেত্রে বাবুরাম মহারাজের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আগে প্রথম ভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি।'

নরেন্দ্রনাথ আর এক 'অগ্নিগোলক', ফায়ার বল। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলছেন, 'তুম তুম করছ কাকে?' সাহেব রেল-কর্মচারী থমকে গেলেন। ঘটনাস্থল আবু রোড স্টেশন। স্বামীজিকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন এক ভারতীয় রেল কর্মচারী। ট্রেন ছাড়ার আগে তিনি কামরায় বসে স্বামীজির সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় এলেন ওই সাহেব রেল-কর্মচারী। তিনি এসেই ভারতীয় কর্মচারীটিকে বললেন, 'নেমে যাও'।

ভারতীয় রুখে উঠলেন, 'নামব কেন?'

শুরু হল দুজনের ঝটাপটি। স্বামীজি থামাবার চেষ্টা করছেন। সাহেব হঠাৎ চড়ে উঠে স্বামীজিকে বললেন, 'তুম কাহে বাত করতা।'

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজির নিজমূর্তি—'তুম তুম করছ কাকে! উঁচু শ্রেণির যাত্রীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানো না!'

সাহেব থতমত খেয়ে বললেন, 'সরি, আমি হিন্দি ভাষাটা ভালো জানি না। আমি শুধু এই লোকটাকে, I only wanted this man...'

স্বামীজির আবার ধমক, 'তুমি বললে হিন্দি ভালো জান না, এখন দেখছি, তুমি তোমার নিজের ভাষাও জানো না। 'লোকটা' কী? 'ভদ্রলোকটি' বলতে পারো না। Now I see that you do not even know your own language. 'This man' of whom you speak is a gentleman.'

'বাবুরাম এখন আমি বিদ্যাসাগর পড়ছি।'

বাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন, 'এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি।'

'আলু পটল বেচিব, মুদির দোকান করিব'

কলেজের পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে বাবু রসময় দত্তের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মতান্তর হল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে ইস্তফা। বাবু রসময়, শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব অনেক বোঝালেন। ঠাকুরদা বলেছিলেন 'এঁড়ে গরু'। একগুঁয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের 'না', 'হ্যাঁ' হল না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন চেষ্টা করলেন, 'চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি?' নির্ভীক বীরপুরুষ তীব্র কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, ' 'কেন, আলুপটল বেচিব, মুদির দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না।'

কলকাতার বাসায় প্রতিদিন ষাট থেকে সত্তরখানা পাতা পড়ছে। সেই খরচ সামলাচ্ছেন। দেশের বাড়িতে প্রতি মাসে ধার দেনা করে পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছেন। ভ্রাতা দীনবন্ধুর মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়ে কলকাতার খরচ কোনো রকমে চলছে। ঈশ্বরচন্দ্র একের পর এক বই লিখে যাচ্ছেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত।

শুভাকাঙ্ক্ষী ময়েট সাহেব একজন ছাত্র পাঠালেন। ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ক। সংস্কৃত, বাঙলা আর হিন্দি শেখাতে হবে। মাস তিনেকের মধ্যে শিক্ষা সমাপ্ত হল। পঞ্চাশ টাকা হিসাবে কয়েকমাসের বেতন ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত, 'আপনি ময়েট সাহেবের বন্ধু, তিনি আমারও পরম আত্মীয়, আপনার বন্ধুর অনুরোধে পড়াতে এসে টাকা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সাগর! ইউ আর গ্রেট।'

ময়েট সাহেব অবাক! কী নির্লোভ মানুষ। জীবনের এই দুঃসময়েও টাকার ঊর্ধ্বে বন্ধুত্ব। সে কী রকম? ঈশ্বরচন্দ্র যখন বন্ধু হন তখন কি হয়? জেনেছিলেন শ্রী মধুসূদন। ফরাসি দেশে দুর্যোগের অন্ধকারে। জেলে যেতেই হবে এমন অবস্থা। 'যখন তাঁহার বঙ্গীয় সুহৃদগণ তাঁহার অনটন, অনশন, পরিশেষে তাঁহার কারাবাসের সম্ভাবনা-সংবাদেও নিরুদ্বেগ সুনিদ্রা-সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন, পুনঃপুনঃ বিপদের সংবাদ আসিলেও ভারপ্রাপ্ত সুহৃদমণ্ডলী যখন কোনো তত্ত্ব লইলেন না, তখন সেই অন্ধকার পথে তড়িতালোকে কোন মূর্তি অঙ্কিত হইল? বিদ্যাসাগর।'

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,

দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।'

কিন্তু মাইকেল বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের নানা বিপদ অস্বীকার করে, অনেক অর্থব্যয়ে মধুসূদনকে ব্যারিস্টার করে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু হায় অশ্রুনয়নে ঈশ্বরচন্দ্র বলছেন, 'মাইকেল এসে সুখে বাস করতে পারেন এমন একখানি পছন্দসই বাড়ি আগে থেকেই ভাড়া করলাম, বিলাত প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসোপযোগী করে সাজিয়ে রাখলাম। বড়ো সাধ, মধুসূদন এসে এই বাড়িতে বাস করবেন, কিন্তু আমার নির্বাচিত সুসজ্জিত গৃহ পড়ে রইল, মধুসূদন উঠলেন স্পেন্সেস হোটেলে।'

বিদ্যাসাগর হাইকোর্টের বারে মধুসূদনের প্রবেশের যাবতীয় বাধা সরিয়ে পথ পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। কিন্তু সাহেব মধুসূদন বাঙালি বিদ্যাসাগরের ধারে- কাছে এলেন না। শেষে এই সেই চিঠি!

'সাদর সম্ভাষণমাবেদনম'

'আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য লিপিদ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনোক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব। তাহার পূর্ণ লক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূলবাবুর (জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের (শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন) নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয়স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও

অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোনো সংশয় নাই।'

হল না। মাইকেল সাহেব টাকা শোধ করলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সংস্কৃত ছাপাখানার তিন ভাগের দুভাগ বিক্রি করতে বাধ্য হলেন।

অবশেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন। সাহিত্যের অধ্যাপক। কিছুকাল পরেই বাবু রসময় দত্ত অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিলেন। সেক্রেটারি আর অ্যাসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারির পদ দুটি অবলুপ্ত করে তৈরি হল একটি মাত্র পদ—প্রিন্সিপাল। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল।

প্রথম পেরেক

কে বলেছেন, কোথায় আছে, যে একমাত্র ব্রাহ্মণই সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী! সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার সময় নিয়ম হয়েছিল, ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য সন্তানরাই সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী হবে। বৈদ্যদের সম্পর্কে একটি অনুশাসন ছিল, তারা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারবে না।

এ নিয়ম তুলে দাও। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার সকলের আছে। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার বিশাল এক ক্ষেত্র আছে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সেই জগতে সকলের প্রবেশ অধিকার আছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই বৈপ্লবিক কথায় পণ্ডিতমণ্ডলীতে শুরু হয়ে গেল মহা কোলাহল। অল্পবয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এ হতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত ধর্মে হস্তক্ষেপ! এই তরুণ পণ্ডিতটি ইংরেজদের খপ্পরে পড়েছে। দেবভাষা সংস্কৃত! ব্রাহ্মণ ছাড়া সেই ভাষা চর্চার অধিকার আর কারো নেই।

বাধা পেলেই ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যরূপ। দুর্জয়, দুর্নিবার, ভয়ঙ্কর। তিনি গর্জে উঠলেন, 'তাই নাকি? যদি শূদ্রের সংস্কৃতচর্চার অধিকার না থাকে তাহলে শূদ্রকুলোদ্ভব, সর্বজনসমাদৃত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সংস্কৃতচর্চার অধিকারী হলেন কীভাবে? পণ্ডিতমণ্ডলী তখন কী ঘুমোচ্ছিলেন? প্রতিরোধ

করলেন না কেন? অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন তখন উঠল না কেন? শূদ্রাদি নীচজাতীয় ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে যদি এতই অসম্মত, তবে কোন ধর্মবুদ্ধিতে আপনারা বেতন নিয়ে সাহেবদের সংস্কৃত পড়ান! তাহলে শুনুন, আপনারা যাকে দেবভাষা বলছেন, সেই ভাষায় একদা ভারতবর্ষীয়েরা কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করতেন। সুতরাং সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদের ভাষা। হয়তো তাও নয়। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা এই ভাষার আদি উৎসস্থল খুঁজে পেয়েছেন। সংস্কৃতভাষীরা এদেশে এসেছিলেন ইরান থেকে। অনেক অনেক আগে ইরানের আদি মানুষেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করেছেন। এঁদের পরিচয় ইরানে ইরানি, ভারতবর্ষে হিন্দু, গ্রিসে গ্রিক, রোমে রোমক, জর্মানিতে জর্মন। সংস্কৃতই রূপান্তরিত হতে হতে, ভারতে সংস্কৃত, গ্রিসে গ্রিক, ইটালিতে লাটিনে, জর্মানিতে জর্মন। তারপর সময় এগোলো, মূল ভাষা ভেঙেচুরে, রূপান্তরিত হতে হতে প্রদেশে প্রদেশে যে-রূপ পেল, তাতে মনে হল কারো সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদরা আজ নিঃসংশয়—মূল ভাষা সংস্কৃতেরই এই পরিণাম।'

একদিকে একা বিদ্যাসাগর অন্যদিকে তাবৎ পণ্ডিতকূল। ঘোর রণে বিদ্যাসাগর জয়ী হলেন। সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল সকলের জন্যে। সংস্কৃত কলেজে শুরু হয়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মযজ্ঞ। তিনি জানতেন, বেন্টিঙ্ক, মেটকাফ, ক্যানিং, স্যার হাইড, হেয়ার, বেথুনের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ সহসা আর এদেশে আসবেন না। কোম্পানির আমল শেষ হয়ে শুরু হবে ক্রাউনের আমল! ঔপনিবেশিকদের দমন-পীড়ন চরমে উঠবে। তখন যাবতীয় ব্যয়সঙ্কোচের দিকে রাজ-কর্মচারীদের নজর পড়বে। আর তখনই বিনাবেতনে শিক্ষাদান উঠে যাবে। শুধু উঠবে না, সুদসমেত দ্বিগুণ, ত্রিগুণ আদায়ের ব্যবস্থা হবে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজে নতুন প্রবেশার্থীদের জন্যে বেতন ধার্য হল। শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক অসমর্থ ছাত্র বিনা-বেতনে পড়ার সুযোগ পাবে।

যথারীতি আবার হইচই। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে একবারই জন্মান। সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অনেক উঁচুতে তাঁর মাথা। ১৮৫০ সালের বিদ্যাসাগর মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন—কী ইংরেজ, কী বাঙালি! কোমলতাময় বীরত্বব্যঞ্জক, প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। তিনি

বিচরণ করছেন কাদের মধ্যে—হার্ডিঞ্জ, ড্যালহাউসি, ক্যানিং, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজমণ্ডলী। তাঁরা সম্ভ্রমে নত হতেন। অপরদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গ, বঙ্গীয় লক্ষপতি জমিদারবর্গ। তাঁর স্নেহদৃষ্টি, সান্নিধ্য কামনা করিতেন। একদিকে বেথুন, বিডন, গ্রে, গ্রান্ড, হ্যালিডে, অপর দিকে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ শ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্র লালা, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ। অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন, জজ দ্বারকানাথ, বক্তা রামগোপাল, হরচন্দ্র, রামতনু, কালীকৃষ্ণ, কালীচরণ, দুর্গাচরণ, শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচরণ, রাজনারায়ণ।

বিদ্যাসাগর অনন্য। বড়োলাট, ছোটোলাট ভবনের সমাদরে, পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে, অথবা পাইকপাড়ার রাজভবনে, পরক্ষণেই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে সকাল-সন্ধ্যা সেবারত।

ব্রাহ্মবন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে হয়েছিল খুঁজে বের করি বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল রহস্যটা কোথায়? তিনি পণ্ডিত! পণ্ডিতের তো অভাব নেই। তা হলে? 'বিদ্যাসাগর চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কী জিনিস যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানব-জীবনের মহত্ব-জ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোটো। কিন্তু ফল অতিশয় বড়ো। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্ত গুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্ম সকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষসিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে সমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্ধ্ব-শির হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।' তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা- সুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।'

সংস্কৃত কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ কেন ছেড়েছিলেন? শাস্ত্রীমশাই জানেন, 'তিনি এককথায় পাঁচশত টাকার চাকুরি ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কী? এই অদম্য, অনমনীয়, মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর শুনিলেন না। বলিলেন, you must,

you must. এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপর জ্বলন্ত প্রয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। কেহই তাঁহাকে রাখিতে পারিল না। স্বয়ং লেফটন্যান্ট গভর্নর পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। গভর্নর যখন বলিলেন, 'তোমার ব্যয়-নির্বাহ হইবে কীসে?' তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'আপনি কী মনে করেন যে, আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না? আপনি ভাবেন কী? এই কলিকাতা শহরে আমি পাঁচ টাকাতে দিন চালাইতে পারি।' তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রধান কারণ রাজপুরুষদিগকে দেখানো যে, তাঁহাদের দাসত্ব না করিয়াও তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ।'

সেই কুঠার

অনেক দিন ধরেই শান দিচ্ছিলেন। সেই বেদান্ত শ্রেণিতে পড়বার সময় থেকেই। অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি অতি প্রবীণ। অথর্ব। ঈশ্বরচন্দ্রকে সন্তানের অধিক ভালোবাসেন। সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারে ছাত্র ঈশ্বরের পরামর্শ নেন। একদিন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, 'দেখো, সংসারে আমার কেউ নেই। বড়ো কষ্টে আছি। লোকে বলছে, এত কষ্ট ভোগ না করে আবার বিয়ে করুন। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনেক বড়োলোক এই ব্যাপারে উদ্যোগী। সুস্বভাবা, বয়স্থা ও সুন্দরী পাত্রীও পাওয়া গেছে। এখন তোমার মত হলেই বাবা, আমি একাজে এগোতে পারি।'

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রবীণ অধ্যাপককে বিনা দ্বিধায় স্পষ্ট বললেন, 'এই বৃদ্ধবয়সে নতুন করে সংসার করা খুব অনুচিত কাজ হবে। আপনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বিবাহ করে একটি নিরপরাধ বালিকাকে চিরদুঃখিনী করবেন না। বিবাহ দূরে থাক বিবাহের চিন্তা করাটাও আপনার পক্ষে পাপ।'

এই কথার পর পণ্ডিতমশাই যেন সাপ দেখেছেন, এইভাবে দূরে পালাতে পালাতে বললেন, 'হ্যাঃ, লাটুবাবুর চেয়ে উনি ভালো বোঝেন!' ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। পণ্ডিতমশাই হাত কচলাতে কচলাতে ফিরে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের হাত দুটি ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন, 'তুমি অনুমতি দাও।'

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বারেবারে সেই একইকথা বলতে

লাগলেন, 'এ মহাপাপ।'

পণ্ডিতমশাই ছাতুবাবু, লাটুবাবুদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ছাতুবাবু, লাটুবাবু ও নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রামরতন রায়ের উদ্যোগে বারাসাতবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধ বাচস্পতির বিবাহ হল।

মর্মাহত ঈশ্বরচন্দ্র বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করলেও মানসিক দূরত্ব বেড়ে গেল। একদিন বাচস্পতিমশাই ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে বললেন, 'ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখতে গেলে না?' ঈশ্বরচন্দ্রের চোখে জল। নিরুত্তর। পরে একদিন বাচস্পতিমশাই ঈশ্বরচন্দ্রকে জোর করে তাঁর বাড়িতে টেনে আনলেন, 'আজ তোমার মাকে দেখতেই হবে।'

ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটি টাকা ধার করলেন। দূর থেকে বালিকা-বধূকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চরণপ্রান্তে টাকা দুটি রেখে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধ ধরে ফেললেন, 'সে কী তোমার মাকে দেখে যাও।' দাসীকে বললেন, 'ঘোমটা খুলে দাও!'

সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া, সেই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।'

'ওরে অকল্যাণ করিস না রে!' এই বলে বাচস্পতিমশাই ঈশ্বরচন্দ্রকে বাইরের ঘরে টেনে আনলেন। 'বোসো! কিঞ্চিৎ জলযোগ কর।'

এইবার ঈশ্বরচন্দ্র নিজমূর্তি ধারণ করলেন, 'এই ভিটেয় আর কখনো জলস্পর্শ করব না!'

যা হবার তাই হল। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ বাচস্পতি পরলোক গমন করলেন। বালিকা পত্নী বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করার জন্যে বেঁচে রইলেন।

আমি শুনেছি

আমি তখন ছাত্র। ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়ে 'বিধবা জীবনের শোকপূর্ণ হৃদয়বিদারক ঘটনা সকল।' আমাদেরই পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবা কন্যা সকলের অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের পথে পদার্পণ করে। ফল—গর্ভসঞ্চার। তখন পিতা-মাতা, মানসম্ভ্রম ও জাতি রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় যা করতে হয় অর্থাৎ গর্ভনাশের চেষ্টা করা হল। সফল

হল না যথাকালে সেই হতভাগিনী বিধবা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। তারপর? সেই বিধবা কন্যার মা—রাক্ষসী গৃহিণী সূতিকা-গৃহে স্বহস্তে সেই নিরপরাধ শিশুটিকে টিপে মেরে ফেলল। এ কী মানুষের দেশ! মানুষের দেশ হলে এতদিনে এর প্রতিবিধান 'বেন্টিঙ্কের বহু চেষ্টায় ভারতে অবলাজাতির জীবন্ত চিতানল নির্বাপিত হইল বটে, তৎপরিবর্তে তুষানলের সৃষ্টি হইল। সতীদাহে একদিন কয়েকঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত, এ আর চিরজীবনেও ফুরায় না। গৃহে যখনই আত্মীয়স্বজনগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, বর্ষীয়সী সীমন্তিনীর সকলপ্রকার সুখসম্ভোগের পার্শ্বে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা সন্ন্যাসিনীর বেশে কালিমাময় বিষাদের জীবন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে! সুপ্রবীণ পিতা নিজের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার বৈধব্যানুষ্ঠানের বিষাদরাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। কোমলপ্রাণা কন্যাও ভগিনীকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী এইরূপেই হইবে!'

ঈশ্বরচন্দ্রের রাতের ঘুম চলে গেল। একাদশীর দিন একই বাড়িতে সধবা খাবেন মাছের মুড়ো আর বিধবা ননদ থাকবেন নির্জলা উপবাসে। বিধবা বোন মেঝেতে আর পাশের ঘরে পালঙ্কে ভাই আর ভাইয়ের বউ রতিক্রিয়ায় রাত পোহাচ্ছেন। বাঃ, বারে সমাজ! বাহারে শাস্ত্র বিধান।

নারীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা! কুলিন কুলসর্বস্ব। নাম বলতে চাই না, 'অমুক গ্রামে অমুক নামে একটি প্রধান কুলিন ছিলেন।' তিন চারটে বিয়ে। অমুক গ্রামে যে বিয়ে হয়, তাতে তাঁর দুটি কন্যা হয়। মেয়ে দুটি মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। বাপের দেখা নেই। মামারাই মানুষ করবে, বিয়ে দেবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। কুলীনের একটাই কাজ, এক স্ত্রীর কাছ থেকে আর এক স্ত্রীর কাছে যাও আর সন্তান উৎপাদন কর। মামাদের অবস্থা হঠাৎ পড়ে গেল। ভগিনীদের বিয়ে দিতে পারলেন না। বড়োটির বয়স আঠারো, পরেরটির বয়স ষোলো।

'এমন সময় একটি লোক মেয়ে দুটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেল। প্রায় পনেরোদিন পরে এই দুঃসংবাদ পেলেন মেয়ে দুটির পিতা। তিনি কলকাতায় এসে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ভাই এতকালে পরে আমার কুললক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। অপহরণকারী যাঁদের কথা রাখবেন এমন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে

সেই কুলীন পিতা ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে বললেন, বাবা, তিন মাসের জন্যে মেয়ে দুটিকে আমায় ফেরত দাও। ঠিক তিন মাস পরে আমি আবার ফিরিয়ে দেব। লোকটি কথা রাখলেন।'

'কুলীন পিতা মেয়ে দুটিকে ঘরে এনে চতুর্দিকে রটিয়ে দিলেন, ফিরিয়ে এনেছি। এক দুর্বৃত্ত আর একটু হলেই অঘরে বিয়ে দিয়ে কুল নষ্ট করে দিচ্ছিল; আমি উদ্ধার করে এনেছি।'

'কুলীন বাড়িতে পাহারা বসালেন। মেয়ে দুটি যেন আর পালাতে না পারে! এরপর কুলীন ঠাকুর বের হলেন অর্থসংগ্রহ ও একটি বরের অন্বেষণে। কিছু টাকার ব্যবস্থা হল। পাওয়া গেল ষাট বছর বয়সের এক বর। বর একটু বেশি টাকা চাইলেন, কারণ কন্যা দুটি কলঙ্কিতা। সে দাবিও মেটানো হল। ষাট বছরের বর একসঙ্গে দুটি মেয়েকে বিয়ে করে কুলীনের কুলরক্ষা করলেন।'

'তারপর! পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলবালারাও অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি আর কেহ তাহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই। সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না। পিতার কুলরক্ষা করিয়াছেন; অতঃপর যথেচ্ছাচারিণী হইলে পিতার কুলোচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। কুলীনঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের। চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অপবাদ আছে। কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অপবাদের আস্পদ নহেন।'

'অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত। তজ্জন্য কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রকাশ করেন নাই।'

কত কৌশল

'কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম ।। সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই একদিন শ্বশুরলায়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। এই গর্ভ তৎসহযোগসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয়।। জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী

ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা। তৃতীয় ॥ অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও অতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান এবং একে একে প্রতিবেশীদের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেকদিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কী পাব, ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম,এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুকগ্রামের মজুমদারদের বাটিতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুকদিন, অমুক গ্রামের হালদারের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন তারা জামাইয়ের সঙ্গে খানিক আমোদ-আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ি কোনো মতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস। এইরূপে পাড়ার বাড়ি বাড়ি বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে এই গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।'

ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তোলিত কুঠার দুটি প্রথার ওপর পড়বে। একটি এই জঘন্য কুলীন বহুবিবাহের প্রথা, আর একটি হৃদয়বিদারক বৈধব্য প্রথা! কুলীন কন্যাদের জন্ম আর মৃত্যু মামার বাড়িতে; কারণ পিতার দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা। বিবাহ করাই তার পেশা। এরা পাচিকা এবং পরিচারিকা। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ। রাত্রিতে নিদ্রাগমন। অন্তবর্তী দীর্ঘকাল উৎকট পরিশ্রম। অশ্রুবিসর্জন। 'উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিল। অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।'

'পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকাবিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ আরো তীব্র, 'আমাদের দশ বৎসরে বেটা-বিউনিরা!!! আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। ওরে ভাই, দক্ষিণদেশে যা দেখেছি... মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম।...যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী... আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম মহা হেয় অপবিত্র বলি। পায়ে দলি। তার ফল—আমরা পশু।'

কতটা পশু!! ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, 'ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রদেশেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকামিনীদের মত দুর্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। স্বামীগৃহবাস, স্বামীসহবাস, স্বামীদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।'

'ঠাকুরদাদা, আপনি অনেক জায়গায় বিয়ে করেছেন, সব জায়গায় যাওয়া হয় কী?'

'যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানে যাই।'

১৮৬৭ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এক ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করেছিলেন, 'এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়েছে, আমি কিন্তু কিছুই টের পাইনি; বিবাহ করে স্বচ্ছন্দে দিন চালিয়েছি।'

গ্রামের বারোয়ারি পূজা। উদ্যোগীরা চাঁদার জন্যে এক ভঙ্গকুলীনকে ধরেছে।

তিনি বললেন, 'কটা দিন অপেক্ষা করো।'

তিনি ঝট করে একটি বিয়ে করে পণের টাকায় চাঁদা দিলেন।

ব্যভিচারিণী কন্যা গর্ভবতী হয়েছেন। সিদ্ধান্ত হল, বাড়ি থেকে দূর করে দাও। হিতৈষী এক আত্মীয় বললেন, 'রোসো, আমি একটা পথ বের করি।'

বেশ কিছু টাকা দিয়ে মেয়েটির স্বামীকে নিয়ে এলেন। স্বামী সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন, 'রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।'

ঈশ্বরচন্দ্রের বেপরোয়া আক্রমণে পণ্ডিত সমাজে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল।

সায়েবদের সাপোর্টে পণ্ডিতটা বড়ো বেড়েছে। রামমোহনটাকে সামলানো গেল না, এটাও দেখি সেই পথে যায়। বলে কীনা বেধবার বে দেবে। কুলীনদের সর্বনাশ করবে।' 'আরে ভাই! বিবাহ না করিলে আমরা খাইব কি?' আমরা যে কুলীন! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে/নিবাস শ্বশুর ঘরে/ মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

পণ্ডিতরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেন—'নৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ'। ঐতিহাসিকদের উক্তি—'তিনি গুরুজনের নিকট আদরের ছেলে, যজ্ঞস্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভামধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর ও প্রবঞ্চক এবং উপপত্নীর আগারে লম্পট মাতাল।'

কৌলীন্যপ্রথার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। গৌড়েশ্বর আদিশূর দেশকে সামাজিক দুর্নীতি, থেকে রক্ষা করার জন্যে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনালেন। শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ আর ছান্দড়।

শ্রীহর্ষ—ভরদ্বাজ গোত্র
ভট্টনারায়ণ—শাণ্ডিল্যগোত্র
দক্ষ—কাশ্যপ গোত্র
বেদগর্ভ—সাবর্ণগোত্র
ছান্দড়— বাৎস্যগোত্র

'ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক, সভৃত্য অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আগমন করলেন। চরণে চর্মপাদুকা, সর্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত। এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমন সংবাদ দাও। দ্বারী নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; পরে দৌবারিক মুখে তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন। এ দেশের ব্রাহ্মণের আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম। কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপুত বা ক্রিয়া কুশল বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না করিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব। এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের বল, আমি কার্যান্তরে ব্যাপৃত আছি। এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করুন; অবকাশ পাইলেই সাক্ষাৎ করিতেছি।'

'এই কথা শুনিয়া দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকট আসিয়া, সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া,

ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডুষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্তী মল্লকাষ্ঠে ক্ষেপণ করিলেন; ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব আশীবার্দবারির স্পর্শমাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। এই অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল। তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, 'বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লানসেনের বাটির দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ; নাম গজারিবৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আর কোথাও নেই। ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। মল্লকাষ্ঠ স্থলে অনেকে গজের আলানস্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।'

নবদ্বীপ, ঐতিহাসিক জায়গা। সেন রাজারা এখানে ছিলেন। নবদ্বীপে বিশাল একটি দিঘির অবশেষ 'বল্লালদিঘি' নামে পরিচিত। তার পাশে বিশাল একটি স্তূপ। সবাই বলেন, 'বল্লাল রাজার' বাড়ি। কত স্মৃতি। ১৫১০ খৃঃ অব্দে শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ, আর আচার্য অদ্বৈত ঐ বল্লালদিঘিতে স্নান করতেন। গোবিন্দদাস চাক্ষুস করে লিখে গেছেন,

প্রকাণ্ড এক দিঘি হয় তাহার নিয়ড়।
কেহ কেহ বলে যাবে বল্লাল সাগর॥
বল্লাল রাজার বাড়ি তাহার নিকটে।
ভাঙাচুরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥

রাজা আদাসূর পাঁচ ব্রাহ্মণকে পাঁচটি গ্রাম দান করলেন, পঞ্চবাটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম। পাঁচটি গ্রামে পাঁচ ব্রাহ্মণের বংশবৃদ্ধি হল। ভট্টনারায়ণের ষোলোটি, দক্ষের ষোলোটি, শ্রীহর্ষের চারটি, বেদগর্ভের বারোটি, ছান্দড়ের আটটি সন্তান হল। কালক্রমে। প্রত্যেক সন্তানকে রাজা একটি করে গ্রাম দান করলেন।

গ্রামের নাম অনুসারে তাঁদের সন্তান-পরম্পরা, 'অমুকগাঁ' বলে প্রসিদ্ধ

হলেন। শান্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশে—বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোলো 'গাঁই'।

কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ বংশে—চট্ট, তাম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গূড়, ভূরিষ্ঠাল, পালধি, পাকড়াসী, পুষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট—এই ষোলো 'গাঁই'।

ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষবংশে—মুখুটি, ডিংসাই, সাহরী, বাই, এই চার 'গাঁই'

সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ বংশে—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘন্টেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, সাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পারিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বারো 'গাঁই'।

বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় বংশে—কাঞ্জিলাল, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী, সিমলাই,—এই আট 'গাঁই'।

বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, পরিশেষে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্র ইতিহাস ও শাস্ত্রের সমান্তরাল পথ ধরে হাঁটছেন। জানেন যুদ্ধ খুব জোরদার হবে। প্রতিপক্ষ প্রবল। যুদ্ধ ঘোষণার আগে নিজের বর্মটি নিশ্ছিদ্র করতে হবে।

এই সময় বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়িতে দুপুরের আহার করে নিতেন। রাতের আহার বাদ। সময় নেই। কলেজের কাজ শেষ করে বিকেল বেলা প্রবেশ করলেন সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে। সারারাত। মানুষটা মরে না যায়! কলেজের কাছেই বন্ধু শ্যামবাবুর বাড়ি। বেশি চিন্তা তাঁর। তিনি হালকা একটা জলখাবার পাঠিয়ে দিতেন। বই আর প্রাচীন কীটদৃষ্ট পুঁথির স্তূপের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র। কাল কেমন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে বর্তমানকে অতীতের মহাফেজখানায় জমা করতে করতে।

তাহলে কী হল আদিসূরের বংশ ধ্বংস হল। সেনবংশীয়রাজারা গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেন। কৌলিন্যমর্যাদার তিনিই পরিপোষক। কান্যকুব্জ থেকে আগত ব্রাহ্মণদের বংশধররা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছেন। আচারভ্রংশ, বিদ্যালাপ। ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যার চর্চায়, আচারনিষ্ঠায়। এ কাদের দেখি কুলাঙ্গার!

মর্যাদাসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ চাই। কুলীন অর্থাৎ উচ্চবংশজাত শ্রেষ্ঠ।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলব যে আচারী, বিনয়ী, বিদ্বান। আমি ব্রাহ্মণ নির্বাচন

করব। পরীক্ষা করব। আমার নটা গুণ চাই— আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান।

বল্লাল সেন স্বয়ং বিদ্বান, সংস্কৃতজ্ঞ। পরীক্ষা করবেন, তা জানিয়ে দিলেন।

কুলীন অর্থাৎ কুললক্ষণ

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম॥

ঈশ্বরচন্দ্র নিজের মনেই হাসছেন। রসিক মানুষ। লিখছেন আর হাসছেন, 'রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যমর্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলিন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হলেন। যাঁহারা দেড়প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য মর্যাদাপ্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন!'

তারপর। কৌলিন্যমর্যাদা ব্যবস্থা হল। কোন নিয়মে তাঁরা বাঁধা থাকবেন রাজা বল্লালের কানুন—কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদানপ্রদান নিষ্ঠাবান করিবেন। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজধাবাপন্ন হইবেন। আর গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে, এককালে কুলক্ষয় হইবেক। এই নিমিত্ত গৌণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু।

ঘটক।। বল্লালসেনের আদেশে কিছু ব্রাহ্মণ 'ঘটক' উপাধি পেলেন। ঘটকদের কাজ হল, কুলীনদের স্তুতিবাদ করবেন, বংশাবলী কীর্তন করবেন।

তদারকিতে থাকবেন, কুলীনরা নিয়মভঙ্গ করছে কী না!

দশটা বছর কেটে গেল। দেবীবর ঘটক সমস্ত ব্যাপারটাকে জটিলতার শেষ সীমায় নিয়ে ফেললেন। বল্লাল যা চেয়েছিলেন,

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্তশ্চতুবিধ॥

'আদান'—অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট ঘর থেকে কন্যাগ্রহণ। 'প্রদান'—অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্টঘরে কন্যাদান। 'কুশত্যাগ' অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যা- দান। সৎকুলে কন্যাদান, সৎকুল হতে কন্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ। কন্যার অভাবে এই আদান-প্রদান সম্ভব নয়। কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হতে পারেন না।

তখন বিধান—ঘটকের সামনে, তাঁকে সাক্ষী রেখে 'কুশময়ী' কন্যা সম্প্রদান।

'বাক্যমাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা।'

বল্লালসেন কুলীনের নটি 'গুণ নির্দেশের' সময় 'আবৃত্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আবৃত্তি শব্দের অর্থ পরিবর্ত। আবৃত্তি হল ওই—'আদান-প্রদান, কুশত্যাগ, প্রতিজ্ঞা। এই নটি গুনের আটটি অদৃশ্য হল। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব নষ্ট। ছিল 'আবৃত্তি'। দেবীবর ঘটক বিশারদ দেখলেন, বল্লাল সেনের সাধের কুলীনকুল সেই গুণেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, ' যে যে কুলীন একাধিক দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদানে নিবিষ্ট করেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল। মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন; অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায় বন্ধন। দেবীবর ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পৃথক পৃথক দেশ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ছত্রিশ মেলে বদ্ধ করেন। তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের প্রাদুর্ভাব অধিক। এই দুই লোকেরাই যারপরনাই, অত্যাচারকারী। গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একাধিক দোষে লিপ্ত ছিলেন। দেবীবর এই দুয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ করেন।

দেবীবর ঘটক

কে এই দেবীবর ঘটক? পিতার নাম সর্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লখাই (লক্ষ্মীনাথ)। প্রপিতামহের নাম অনন্ত। এঁরা সবাই বন্দাবংশ-অবতংস। জনশ্রুতি এই যে, দেবীবরের মাসতুতো ভাই যোগেশ্বর পণ্ডিত যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে মধ্যাহ্নকালে দেবীবরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন; কিন্তু কুলমর্যাদার অহঙ্কারে অন্নগ্রহণ না করেই প্রস্থান করলেন। দেবীবর সেই সময় বাড়ি ছিলেন না। বাড়ি এসে সমস্ত শুনলেন। মা কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে এই অপমানের কথা শোনালেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, এর প্রতিশোধ নেবেন। মা বললেন, বাবা, তুমি মা কালীর আরাধনা করো। দেবীবর সিদ্ধিলাভ করে বাকসিদ্ধ হলেন। এরপর দেবীবর রাঢ় ও বঙ্গের কুলীনদের কৌলীন্য মর্যাদার খোঁজখবর নিতে লাগলেন। মাসতুতো ভাই যোগেশ্বর পণ্ডিত কত বড়ো মর্যাদাসম্পন্ন জানতে হবে। দেবীবরের গবেষণা শুরু হল। গবেষণালব্ধ জ্ঞান হল কুলীনদের অধিকাংশই কৌলিন্যগুণ হারিয়েছেন। দেবীবর কুলীন-সমাজের দোষ-সংস্কারের অভিপ্রায়ে এক সামাজিক সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় দেবীবর কুলীনদের ছত্রিশটি 'মেলে' আবদ্ধ করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র অতীত থেকে একে একে সব উদ্ধার করছেন। কুলীনদের 'বল্লাল সেনী' অহংকারের কাঠামো কী ভাবে চুরমার হচ্ছে। বাকসিদ্ধ তান্ত্রিক দেবীবর, গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেলবন্ধন করে নাম রাখলেন ফুলিয়া। এঁরা দুজনেই একদোষে দোষী। দোষ চতুষ্টয়। চারটি দোষ—নাধা, ধন্ধ, বারুইহাটি, মুলুকজুরী। ব্যাপারটা কি?

নাধা একটা জায়গার নাম। বন্দ্যোপাধ্যায়রা সেই জায়গার 'বংশজ' কুলীন।

গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর এই বাড়িতে বিবাহ করেন। বংশজ- কন্যা বিবাহ করার দোষে তাঁর কুলক্ষয় হল। তিনিও বংশজ হলেন। মনোহরের কুলরক্ষার জন্যে ঘটকেরা পরামর্শ করে নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'শোত্রিয়' করে দিলেন। নাধার বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর 'বংশজ' হয়েও, 'মাষচটক' নামে শ্রোত্রিয় পরিচিত পেলেন। ঘটকদের অনুগ্রহে মনোহরের কুল কোনোভাবে রক্ষা পেল। এই দোষের নাম **নাধাদোষ**।

ঈশ্বরচন্দ্র এক টিপ নস্যি নিলেন। কুলশাস্ত্রের চেয়ে গণিতশাস্ত্র অনেক সহজ। এ যেন জটিল অরণ্যে পথ হারানো।

ধন্ধদোষ—শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিত কন্যা ছিল। হাঁসাই নামক

এক মুসলমান ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্বক ঐ দুই কন্যার জাত নষ্ট করে। পরে এক কন্যাকে 'কংসারিতনয়' পরমানন্দ পূতিতুণ্ড, ও আর এক কন্যাকে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। এই গঙ্গাধরের সঙ্গে নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদান-প্রদান হয়। আবার নীলকণ্ঠ গঙ্গার সঙ্গে আদান-প্রদানের ফলে গঙ্গানন্দ যবন দোষে দূষিত হলেন। এই যবন দোষই ধন্ধদোষ।

দেবীবর এই সুযোগে মাসতুতো ভাই যোগেশ্বর পণ্ডিতকে কুলহীন করে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। পরে অবশ্য তাঁর কৌলিন্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সভায় দেবীবরের গুরু শোভাকর চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আশা করেছিলেন, শিষ্য তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কৌলীন্যের মর্যাদা দান করবেন; কিন্তু বাকসিদ্ধ দেবীবরের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,

'ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।'

গুরুও কম যান না! তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

'ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্বংশ দেবীবর'।

গুরুর অভিশাপে সত্য সত্যই তিনি নির্বংশ হয়েছিলেন।

এ-সব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর গভীর গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে এলেন, 'কৌলীন্যের নিয়মানুসারে, কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তি অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ।' মেলবন্ধনের আগে কুলীনদের আটঘরের মধ্যে আদান-প্রদান চলত। একে বলা হত 'সর্বদ্বারী বিবাহ'। ফলে আদান-প্রদানের কিছুমাত্র অসুবিধে ছিল না। এক ব্যক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করার প্রয়োজন হত না। কোনো কুলীন কন্যাকেই আজীবন অবিবাহিত থাকতে হত না। দেবীবরের ব্যবস্থায় ঘর কমে গেল। কাল্পনিক কুলরক্ষার জন্যে এক পাত্রে অনেক কন্যাদান অপরিহার্য হয়ে উঠল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে হাত মেলালেন পণ্ডিত রামানায়ণ তর্করত্ন। লিখলেন নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'। 'কৌলীন্য প্রথার মুলে কুঠারঘাত'। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 'বিদ্যাসুন্দর'-এ লিখলেন,

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদিবা হইল বিয়া কিছুদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।।

'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ—দুশো বছরেও কৌলীন্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজের বুকে গেড়ে বসে আছে। যশস্বী হতে পারতেন যে কবি, দ্বারকানাথ অধিকারী, মাত্র আটাশ বছর বয়সে পরলোকগমন করলেন, তেরো বছরে এই কবিতাটি লিখে গেছেন।

কুলীনগণের বিবরণ

শুন শুন সর্বজন করি কিছু নিবেদন
কুলিনগণের বিবরণ।
হয় যবে প্রথমতঃ গাঁজা অহিফেনে রত
পরিশেষে মদে মত্ত হন।।
গেলে পরে ভিন্নগ্রাম বিষ্ণু ঠাকুরের নাম
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে।
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত।
লোভদেবীর আজ্ঞা মতে আরোহিয়া স্পৃহারথে
অগ্রে করে পণের বিহিত

ঈশ্বরচন্দ্র চাবুক

কুলাভিমানী মহাপুরুষগণ, কুলীন বলে অভিমান! সমাজে পূজনীয়। আপনাদের চরিত্র—শতচ্ছিদ্র। কোনো ধর্মের ধার ধারেন না। আপনারা পূজনীয়! জঘন্য, ঘৃণ্য! দয়া, ধর্মভয়, লোকলজ্জা কিছুই নেই আপনাদের। কন্যাসন্তানের সুখ-দুঃখ, হিতাহিতের কোনো চিন্তাই আপনাদের নিথর হৃদয় স্পর্শ করে না। কন্যাটিকে যে কোনো উপায়ে কুলীন পাত্রস্থ করতে পারলেই শান্তি। মরুক বাঁচুক, জীবন তছনছ হয়ে যাক, কী জীবন্মৃত হয়ে থাক, কিছুই দেখার দরকার নেই। কুলরক্ষা হয়েছে। ব্যাস্, আর কী! 'অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাটি হইতে বহির্গত হইয়া গেলে তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে; বাটীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও ভ্রূণহত্যাপাপে বারংবার লিপ্ত হইলে

কোনও দোষ ও হানি নাই। কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা বা ক্ষতিবোধ হয় না।'

কুলীনরাই অকাল বৈধব্যের কারণ

কাশী, বৃন্দাবন বাঙালি বিধবায় ভরে উঠুক। কান পেতে শোনো কী বলে ওরা—'রাঁঢ় আর ষাঁড় এই নিয়ে বারাণসী। শোনো, শোনো অলস, অকমর্ণ্য, অদৃষ্টবাদীর দল। যাদের দোষে কুলীনকন্যাদের এই দুরবস্থা, সকলেই যদি তাঁদের ওপর অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করতেন, তাহলে ক্রমে অসহ্য এই অত্যাচার নিবারণ হতে পারত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, এই অত্যাচারকারীরা দেশস্থ লোকের কাছে অতি মাননীয়, পূজনীয়। এই অত্যাচার নিবারণের কি উপায়? রাজদ্বারে আবেদন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করে একটি আইন বিধিবদ্ধ করা, এই হল পথ।

রাজা রাজবল্লভ চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন, তাঁর বিধবা কন্যাটির পুনর্বিবাহ। নানাদেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যবস্থা আনিয়েছিলেন। বিক্রমপুরের কয়েকজন স্মার্ত ভট্টাচার্য তাঁকে প্রচুর সাহায্য করলেন। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে সব পন্ড হল। রাজা রাজবল্লভ ঢাকার ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতগণের ইতিবাচক সিদ্ধান্তসহ তাঁর সভাপণ্ডিতদের পাঠালেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের অনুমোদন চাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুব খাতির করলেন। বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদের সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসলেন। পণ্ডিতরা বললেন, 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত।' মহারাজ অদ্ভুত কথা বললেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ।' কৃষ্ণচন্দ্রের মহা ঈর্ষা! এক বৈদ্য চির অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করে ইতিহাস হয়ে থাকবে—অসহ্য। পণ্ডিতদের বললেন, ক্ষমতাশালী রাজবল্লভের শত্রুতা করার সাহস আমার নেই। সে-কাজ আপনারা করবেন। বিনিময়ে প্রচুর উপঢৌকন। প্রকাশ্য সভায় আমি আপনাদের এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করার

অনুরোধ করব। আপনারা একবাক্যে অস্বীকার করবেন। আমি তখন খুব তিরস্কার করব। আপনারা তখন জোর গলায় বলবেন—রাজা, মহারাজা কারোর অনুরোধেই এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে আমরা পাপগ্রস্ত হতে পারব না।

রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরি ধরতে পারলেন না। কন্যার বিবাহ হল না। কৃষ্ণচন্দ্র পরে অক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হায়, আমি কেন আগেই এই বিষয় সাধনে যত্নশীল হইনি!'

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ॥ বহুবাজার নিবাসী নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি।

তৃতীয় প্রচেষ্টা ॥ কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন। পণ্ডিতসভা আহ্বান করলেন। শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করলেও ব্যবস্থাপত্র দিতে সাহসী হলেন না। কিন্তু রাজার অনুরোধে পরে রাজি হলেন। এমন সময় বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও বারাসাতের বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরের নব্য সম্প্রদায়কে নিয়ে বিরাট এক আন্দোলন তৈরি করে ফেললেন, বিধবা বিবাহ চালু করতেই হবে। সভা-সমিতি, জনমত সংগঠন। বেরিয়ে এলেন বীরনগর নিবাসী জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়। প্রবল প্রতিপক্ষ। ঘাত-সংঘাতে নবদ্বীপ বিপর্যস্ত। ভেস্তে গেল সংস্কার আন্দোলন।

শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ আছে কী নেই! ঈশ্বরচন্দ্রের লড়াই শাস্ত্রধারী পণ্ডিতদের সঙ্গে। শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রে লড়াই করতে হবে। সেদিন একদিন। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে ঈশ্বরচন্দ্র পুঁথির পর পুঁথি দেখে চলেছেন। একটা সমর্থন কোথাও কী নেই! আর একটা রাতও ভোর হয়ে এল। পেয়েও যেন পাচ্ছেন না! ছায়া ধরছেন কায়া কোথায়! সে যে পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে ধরা। নাঃ, আরো একটা রাত নিষ্ফলা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এইবার বাড়ি ফিরে সামান্য বিশ্রাম। পথে শেষ রাতের পাতলা অন্ধকার। দূরে দূরে নিষ্প্রভ গ্যাসের বাতি। একা একটি মানুষ হাঁটছেন। একটু পরেই প্রভাতী কীর্তন পথে প্রকাশিত হবে। হরিনামকারীরা হ্যারিসান রোড ধরে গঙ্গার দিকে এগোবেন।

হঠাৎ! হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, মনে কীসের একটা আভাস! কিছু একটা

দেখা যাচ্ছে। আবার ফিরে এলেন লাইব্রেরির সেই চেয়ারে। একটি শ্লোক ও তার অর্থ! অর্থের আড়ালে যে অর্থ, সেটি যেন ঝলসে উঠল!

পেয়েছি! পেয়েছি! ইউরেকা

'পরাশর সংহিতার' তিনটি শ্লোক,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পাতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।।
মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।
তিস্রঃ কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গৎ ভর্তাবং যানুগচ্ছতি।।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইল, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।

পেয়েছি পেয়েছি, যা খুঁজছিলাম, তা আমি পেয়ে গেছি।

প্রথম সূর্যের আলো ফাঁক-ফোকর দিয়ে, বইয়ের র‍্যাকের পাশ দিয়ে, রেখার আকারে ঘরের মেঝে স্পর্শ করেছে। আলো আরও আলো। পরাশরের তিনটি বিধান কলিযুগের বিধবাদের জন্যে। বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করা কঠিন প্রস্তাব। ঘরে ঘরে ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা। সহগমন, রাজা রামমোহন বন্ধ করতে পেরেছেন। লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সেই কারণেই সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধান দিয়েছেন। 'পরাশর সংহিতাই' কলিযুগের শাস্ত্র। পেয়েছি! পেয়েছি! ইউরেকা।

একটি পুস্তিকা তৈরি করলেন—বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। 'বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।' অল্পকথায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ। প্রচারের আগে পিতার অনুমতি চাই। বীরসিংহে গিয়ে পিতাকে বললেন। 'দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ

করে বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্যে এই পুস্তকটি প্রণয়ন করেছি। আপনি শুনে এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে, আমি প্রকাশ করতে পারি না।'

ঠাকুরদাস, 'যদি এ বিষয়ে আমি মত না দিই, তাহলে তুমি কি করবে!'

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব। আপনার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের প্রচার হবে না।'

'আচ্ছা, কাল নির্জনে বসে সব শুনে মতামত দোব।'

পরদিন একান্তে বসে ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে সব শোনালেন। ঠাকুরদাস প্রশ্ন করলেন,

'তুমি কি বিশ্বাস করো, যা লিখছ তা সব শাস্ত্রসম্মত হয়েছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'তাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নেই।'

ঠাকুরদাস বললেন, 'তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ঈশ্বরচন্দ্র এইবার মায়ের কাছে গেলেন, 'মা, তুমি তো শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু বুঝবে না, আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বইটি লিখেছি, তুমি মত না দিলে ছাপাতে পারব না। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে।'

ভগবতী জোর গলায় বললেন, 'আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। লোকের চক্ষুশূল, মঙ্গলকর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হয়ে সারাজীবন চোখের জল ফেলার চেয়ে বিয়ে করে সুখী হওয়া অনেক ভালো। এই ব্যবস্থা যদি তুমি করতে পারো, আমি তোমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করব। তবে সাবধান, উনি যেন জানতে না পারেন। ওঁকে কিচ্ছু বলো না।'

'কেন মা, ওঁকে কেন বলব না?'

'কারণ, তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুললে ওঁর অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা।'

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'বাবা কিন্তু মত দিয়েছেন।'

'তাই না কী! তবে আর কি? তবে আর ভয় কীসের!'

১৮৫৬, জুলাই ২৬

বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। যথারীতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও তাঁর দলবল ছাড়া অনেকেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করলেন। প্রথম স্বাক্ষরকারী উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তারপর প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র। এছাড়া বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর স্বতন্ত্র একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সরকারের কাছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ, শ্রীচন্দ্র ঢাকার জমিদার ও অন্যান্য ধনী হিন্দুগণ, ময়মনসিংহের জমিদারদের অনেকে সমবেত হয়ে আর একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এই আবেদনপত্র পাঠাবার সময় গুরুতর একটি প্রশ্ন দেখা দিল—বিধবার বিবাহান্তে তাঁর গর্ভজাত সন্তানরা 'দায়ভাগ' অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার যদি না পায় তা হলে কী হবে! সেই কারণে সবার আগে সরকারের কাছে দায়ভাগের সঙ্গতি রক্ষার জন্যে একটি আবেদনপত্র পাঠান হল।

প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ সমবেত হয়ে ঐ আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানানোয় বঙ্গদেশ উত্তাল। সর্বত্র তুমুল আন্দোলন। পাঁচালীকার দাশরথি রায় তার বর্ণনা দিয়েছেন।

বিধবারবিবাহ-কথা কলির প্রধান কলিকাতা,
নগরে উঠিছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান
হবার কথা হয়ে উঠছে সব॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম ধন্যগন্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্তা বাঙালির, তাতে আবার কোম্পানির
হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক॥
বিবাহ দিতে ত্বরায় হাকিমের হয়েছে রায়
আগে কেউ টের পায়নি সেটা।
তারা করাল অর্ডার, জেতে কার অর্ডার
চটুকে বুদ্ধি আটকে রাখবি কেটা?
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম-বৃদ্ধি প্রজা-বৃদ্ধি

এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে।
গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র হই হই, ধন্য ধন্য বিদ্যাসাগর। গান ঘুরছে মুখে মুখে,
বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

শান্তিপুরের তাঁতিরা বহুমূল্য বস্ত্রের পাড়ের উপর বিধবা-বিবাহের গান বুনতে শুরু করে দিলেন। গুণের মুনি পরাশর, যার কথাতে বিচ্ছেদ-শর। ভুগিতে হয় না প্রাণেশ্বর মলে। দিদি গো! এই কলিতে, যে ধর্মে হয় চলিতে। ব্যবস্থা দিয়েছেন তিনি বলে। শান্তিপুরের বয়ন শিল্পীরা যে অনুরাগ আর শ্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের এই যুগান্তকারী প্রয়াসকে বঙ্গে প্রচার করলেন তা অভাবনীয়। পূর্বে হয়নি, পরেও হবে না। পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব, কলিতে আর এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র।

লেজিসলেটিভ কাউনসিলে মহামান্য জে. পি গ্রান্ট বিলটি পেশ করার সময় মুখবন্ধে বললেন, The Bill now presented will wipe out that blot in the Municipal law of India, It will prevent the tenets of one set of men from inflicting misery and vice upon the families of their neighbours, who are of a different and more humane persuasion.

প্রাচীন পন্থীরা প্রাচীন ধারায় চলতে চাইলে চলুন, কিন্তু নবীনের পথে রোধ করতে চাইলে এই আইন হবে নবীনপন্থীদের হাতিয়ার। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজের গণ্যমান্য, শ্রদ্ধেয়, তিনিই এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি—the chief mover of this agitation out of which the bill had arisen.

দিদি, ফিরেছে কপাল

প্রথম বিবাহ, পাত্র খাঁট্‌য়া গ্রামের সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী, বর্ধমান জেলার পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। বিধবা-বিবাহের আইন ঘোষিত হওয়ার তিনমাস পরে এই প্রথম বিবাহ।

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৫৬ রবিবার। শীত শীত কলকাতা। আটশো নিমন্ত্রণপত্র

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে গেল। কয়েকটি নিমন্ত্রণ-পত্র সংস্কৃত কবিতায় অপূর্ব।

আন্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং পদ্মিনী প্রাণকান্ত
স্বাহাকান্তে ক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে শাস্ত্রমার্গানুসারী।
ভুয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধিভর্তৃহীনাত্মজায়াঃ।
সূর্যোবর্যার্থবিজ্ঞেরিহ সদাস গতৈমৎকৃপাপারতন্ত্রাৎ।।

সে এক মহাসমারোহ। কন্যা কালীমতি দেবী মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রয়েছেন। বর শ্রীশচন্দ্র আসছেন সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের বাড়ি থেকে। সুকিয়া স্ট্রিট, তার চারপাশের পথ লোকে লোকারণ্য।

'পারফেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার ঈশ্বরচন্দ্র পুলিসপ্রহরার ব্যবস্থা রেখেছেন।

রব উঠল, 'বর আসছে, বর আসছে'।

জনারণ্যভেদ করে বরের পাল্কি এগোতে পারছে না। পালকির দুপাশ ঘিরে রেখেছেন বিশিষ্ট সব ব্যক্তিরা—রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র। পাল্কি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

সবাই দেখছেন বর। বিদ্যাসাগর দেখছেন, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সংগ্রাম এগোচ্ছে বাস্তবের দিকে। প্রগতির পালকি, নারীমুক্তির পালকি। উজ্জ্বল এক শতাব্দীর শিবিকা। আলোর অগ্রসর দেখার জন্যে শহর ভেঙে পড়েছে। থমকে গেছে অন্ধকার। অনেকদিন পরে আজ এই নরম শীতের রাতে কালীমতি আবার হাসবে।

কই রে ছিরে! আছিস তো

ধর্মগুণ্ডারা পথে নেমে পড়েছে। বিদ্যাসাগরের রক্ত চাই। কাফের। আর এক মুহূর্তও ওই বিধর্মীটাকে বাঁচতে দেওয়া যায় না। শক্তিমান রাজা রামমোহন ডাণ্ডার বাইরে চলে গেলেন। তাঁর চেয়েও শক্তিশালী সমাজ-শত্রু আমাদের হাতের মুঠোয়। ঠাকুরদাস জানতেন, বিদ্যাসাগরের জীবন বিপন্ন হবে। দেশ থেকে পাঠিয়ে দিলেন লেঠেল শ্রীমন্ত সর্দারকে, সর্বক্ষণের প্রহরী।

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে গোরা সৈন্যদের ক্যাম্প হয়েছে। শ্রীমন্ত লাঠি হাতে ঢুকছে। যাবে বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কাছে।

গোরারা পথ আটকাচ্ছে। তারা যেতে দেবে না। শ্রীমন্ত যাবেই। গোরারা বন্দুক উঁচিয়েছে। সংস্কৃত কলেজে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় আর কী এমন সময় এসে পড়লেন তাদের কমান্ডার 'হোয়াটস দিস, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং, লেট হিম গো। হি ইজ আউর পণ্ডিতস বডিগার্ড।'

ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমন্তকে বললেন, 'তোর তো মহা দুঃসাহস!'

শ্রীমন্তর অসাধারণ উত্তর—'দেশের লোক সবই তো এক-একবার নাড়াচাড়া করে দেখেছি, সুযোগ পেয়ে গোটাকতক সাহেব পরখ করছিলুম।'

'ওদের হাতে বন্দুক যে রে!'

'রাখো তোমার বন্দুক! বন্দুক গাদতে গাদতেই আমার লাঠি কেল্লা মেরে দেবে! বন্দুক এক-একবার, এ লাঠি অনবরত ঘোরে। লাঠির কাছে বন্দুক!'

সংস্কৃত কলেজ থেকে বেরোতে সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র ঠনঠনিয়া কালীতলার কাছাকাছি এসে পড়েছেন, ঘুপচি থেকে বেরিয়ে এল একদল প্রাণঘাতী ধর্মগুণ্ডা। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝে গেলেন, জীবনের আজই শেষ রাত। কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তিনি এগোতে এগোতে বললেন,

'কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্ কি?'

ছায়ার উত্তর—'তুমি চলো না! এগিয়ে চলো। কে আসে,
কে যায়, সে আমি দেখব। তুমি
এগিয়ে যাও।'

অন্ধকারের গুণ্ডারা আলোর লাঠি দেখে ভয়ে পালাল।